ডিসেম্বর ২০২০। উদ্বোধন সংখ্যা

ফোটন

একটি শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন

আমাদের শিক্ষক ঃ নুমেরি সাত্তার অপার

বুয়েট বৃত্তান্ত

অনলাইন ক্লাস ও আমরা

ডিসেম্বরের শহরে

স্কিল ডেভেলোপমেন্ট

ধারাবাহিক কোর্সঃ আরডুইনো

চলো জাপান যাই!

অন্তিম সময়।

ফোটন

ডিসেম্বর ২০২০ | উদ্বোধনী সংখ্যা

প্রধান পরিকল্পক

নুমেরি সাত্তার অপার

প্রচ্ছদ ও সম্পাদক

মোঃ তারিকুজ্জামান

সহ - সম্পাদক

রামিসা হক চৌধুরী

জান্নাতুল ফেরদৌস মমো

ডিজাইনার

রিফাত আহমেদ

প্রচার ব্যাবস্থাপনা

ইফতেখার রিমন

সহযোগিতায়

আশরাফী জাহান জান্নাতী

জুনায়েদ মোহাম্মদ

লাবিবা সালয়া ইসলাম

জাহরা আঞ্জুম

বিনিতা আগারওয়াল

মেহজাবিন সুলতানা দিয়া

তাসিন, জাহিদুল রহমান

ফাহিম আবরার

বিনামূল্যে বিতরণ যোগ্য

উৎসর্গ

-বাংলার গৌরব ও অহংকার।
-বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণকে।
-তাঁদের ত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি বিজয়ের ৪৯তম ডিসেম্বরে, যাদের রক্ত ও অশ্রু দিয়েই লেখা হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস।

ফোটন

ফোটন

একটি শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন

ফোটন নামটি শুনে এক ঝলক মনে হতে পারে এটা বুঝি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের জন্য। আসলে নয় । ফোটন মানে আলোর এক কণা। যেই আলোর পিছনে, যে স্বপ্নের পিছনে, যে আশার পিছনে ছুটে চলে আলোকিত জীবনের আশায় । সেই আলোকিত জীবন, আলোকিত বাংলাদেশের প্রতিটি কণা আমরা। আলোকিত বাংলাদেশের এক একটি ফোটন আমরা। সেই ফোটন দের জন্য তোমাদের নিজেদের এই ম্যাগাজিন। যেখানে আমরা চেষ্টা করি কিছু স্কিল নিয়ে আলোচনা করতে , কিছু জ্ঞান শেয়ার করতে যাতে আজকের তোমরা আসলেই নিজে একেকটা ফোটন হতে পার। ছড়াতে পারো আলো নিজের শক্তিতে যেই শক্তি তে আলোকিত হবে পরবর্তী প্রজন্ম । এখানে "ফোটন" এর ক্ষেত্রে আমি শুনতে চাই যদি কখন ফোটন আসতে দেরী হয় তাহলে বলতে যে আমাদের ফোটন কোথায়। এই ম্যাগাজিন টা কারো নয় এই ম্যাগাজিন তোমাদের। তোমরাও সেটা নিজেদের মতোই নিবে । তাহলে এখনো বসে বসে আমার এইসব বোরিং পড়া পড়ছ কেন? এখনি ঢু মারো বইয়ের ভিতরের। আমরা হবো ফোটন একদিন।

সাইন্স-ফিকশন
সময়ের যাত্রা
অন্তিম সময়
ডঃ ম্যাক্স

ব্লগ
কোমল পানীয়
অনলাইন ক্লাস ও আমরা
নীহারিকা পুঞ্জ
হাইপার লুপ সমাচার

আমাদের শিক্ষক
নুমেরি সাত্তার অপার

ভার্সিটি রিভিউ
বুয়েট বৃত্তান্ত

ডিসেম্বর স্পেশাল
ডিসেম্বরের শহরে

স্কিল ডেভেলোপমেন্ট
১২ ধরনের চাকরি যেখানে প্রোগ্রামিং লাগে না

ধারাবাহিক কোর্স
আরডুইনো

নিয়মিত বিভাগ
অবাক হলেও সত্য
এই মাসে
এডমিশন প্রশ্ন

উচ্চশিক্ষা
চলো জাপান যাই!

গল্পপাঠ
জগাখিচুড়ি ও সংকারয়ন

ফোটন

১লা ডিসেম্বর

এইডস । একটি প্রানঘাতী রোগ । যা HIV ভাইরাস এর কারণে হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে এই প্রানঘাতী রোগের সতর্কতা স্বরুপ এই দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

WORLD AIDS DAY

২রা ডিসেম্বর

১৮৮৫ সালের এই দিন বোস্টনে নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ মিনোট জন্মগ্রহণ করেন ।

৩রা ডিসেম্বর

১৬২১ সালের এইদিনে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপ তৈরি করেন ।

৪ই ডিসেম্বর

পারস্যের বিখ্যাত কবি, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ উমর খৈয়াম ১১২৩ খ্রিস্টাব্দের এইদিনে মৃত্যুবরণ করেন ।

৫ম ডিসেম্বর

১৯০১ সালের এইদিনে বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ জন্মগ্রহণ করেন ।

ফোটন

৬ষ্ঠ ডিসেম্বর

ব্রিটিশ রসায়নবিদ জর্জ পোর্টার ১৯২০ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়নে ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

৭ম ডিসেম্বর

জার্মান চিকিৎসক থিওডোর সোয়ান ১৮১০ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান প্রাণীতে

৮ম ডিসেম্বর

১৯৯৪ সালের এইদিনে রন্টজেনিয়াম প্রথম তৈরি করা হয়। এর নামকরণ করা হয়েছে পদার্থবিদ উইলহেলোম রন্টজেন (বানান অনুসারে) রন্টজেন), যিনি এক্স-রে আবিষ্কার করেছিলেন ।

১০ম ডিসেম্বর

১৮৯৬ সালের এই দিনে বিখ্যাত পদার্থবিদ আলফ্রেড নোবেল মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মরণে প্রতিবছর ১০ই ডিসেম্বর নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

১১ম ডিসেম্বর

ব্রিটিশ রসায়নবিদ জর্জ পোর্টার ১৯২০ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়নে ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।ব্রিটিশ রসায়নবিদ জর্জ পোর্টার ১৯২০ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়নে ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

ফোটন

১২শ ডিসেম্বর

১৯০১ সালের এইদিনে গুগলিয়েলমো মার্কোনি কর্নওয়ালের পোল্ডু থেকে প্রথম ট্রান্সলেট্যান্টিক রেডিও সিগন্যাল প্রেরণ করেছিলেন, যা নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জনসে পার্সি রাইট পেজে পৌঁছায়।

সুইস রসায়নবিদ আলফ্রেড ওয়ের্নার ১৮৬৬ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম অজৈব রসায়নবিদ হিসেবে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

১৩শ ডিসেম্বর

ডোবেরেইনারের ত্রয়ীসুত্ররের কথা কেই না জানে? জার্মান এই বিজ্ঞানী ১৭৮০ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪শ ডিসেম্বর

- ১৫৪৬ সালের এই দিনে বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০০ সালের এইদিনে ম্যাক্স প্লাঙ্ক তার কোয়ান্টাম থিওরি প্রকাশ করেন
- ১৯০৩ সালের এইদিনে রাইট ব্রাদার্স রাইট ফ্লায়ারের মাধ্যেমে প্রথম আকাশে উড়ার চেষ্টা চালান।

১৫শ ডিসেম্বর

- তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক হেনরি বেকেরেল ১৮৫২ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ফ্রান্সের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের স্থপতি গুস্তাভ আইফেল ১৮৩২ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

ফোটন

১৬শ ডিসেম্বর

যেখান থেকেই আমরা পেলাম বিজয় সেখানে অন্য কিছুর নাম আশা করতে পারছি না। আজ আমাদের বিজয় দিবস

১৭শ ডিসেম্বর

স্যার হামফ্রে ডেভি ১৭৭৮ সালে এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালের এইদিনে উইলিয়াম থম্পসন মৃত্যুবরণ করেন

১৭শ ডিসেম্বর

ইলেক্ট্রনের আবিষ্কারক স্যার জে জে থমসন ১৮৫৬ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৬৬ সালের এইদিনে শনির উপগ্রহ এপিমেথিয়াস আবিষ্কৃত হয়।

১৮শ ডিসেম্বর

লেক্ট্রনের আবিষ্কারক স্যার জে জে থমসন ১৮৫৬ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৬৬ সালের এইদিনে শনির উপগ্রহ এপিমেথিয়াস আবিষ্কৃত হয়।

১৯শ ডিসেম্বর

ইলেক্ট্রনের আবিষ্কারক স্যার জে জে থমসন ১৮৫৬ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৬৬ সালের এইদিনে শনির উপগ্রহ এপিমেথিয়াস আবিষ্কৃত হয়।

২০শ ডিসেম্বর

- আমেরিকান পদার্থবিদ রবার্ট ভ্যান ডি গ্রাফ ১৯০১ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ-ভোল্টেজ ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটরের নকশা এবং নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
- ১৯৫১ সালের এইদিনে আইডাহোর পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্রে প্রথম(বিশ্বে) বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে চারটি বাল্ব জালানো হয়।

২১শ ডিসেম্বর

- ম্যারি কিউরী, পিয়ের ক্যুরি, অঁদ্রে-লুই দ্যবিয়ের্ন ১৮৯৮ সালের এইদিনে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন।
- Apollo program: মানবজাতির প্রথম চন্দ্র অভিযান অ্যাপোলো ৮(Apollo-8) যা ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে চালু হয়। প্রথমবারের মতো বিমান পরিচালিত ট্রান্স লুনার ইনজেকশন ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে মিশনটি সম্পন্ন করে এবং হয়ে ওঠে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ত্যাগকারী প্রথম মানুষ।

২২শ ডিসেম্বর

১৮৮৭ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী শ্রীনিবাস রামানুজন ।

ফোটন

২৩শ ডিসেম্বর

- ১৯৩৮ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর প্রথম কয়েলকান্থ নমুনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের চালুমনা নদীর (বর্তমানে টাইলোম্নকা) উপকূলে সন্ধান পাওয়া যায়।
- জোসেফ এডওয়ার্ড মারে 23 ডিসেম্বর, 1954 সালে অভিন্ন যমজ রিচার্ড এবং রোনাল্ড হেরিকের উপর প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করেছিলেন ।

২৪শ ডিসেম্বর

1936: প্রথমবারের জন্য রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করা হয় ।

২৫শ ডিসেম্বর

মাথায় আপেল পড়া বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৪২ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে পৃথিবীর সেরা পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন ধরা হয়।

২৬শ ডিসেম্বর

- আধুনিক কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ ১৭৯১ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- রেডিয়াম যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ, তা ১৮৯৮ সালের এইদিনে ম্যারি কুরি ও পিয়েরে কুরি ঘোষণা দেন।

২৭শ ডিসেম্বর

- বিজ্ঞানী ল্যুই পাস্তুর ১৮২২ সালের এইদিনে ফ্রান্সের জুরায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৫৭১ সালের এই দিনে জোহান কেপলার জার্মানির স্টুটগার্ট এ জন্মগ্রহণ করেন।

২৮শ ডিসেম্বর

- গ্যালিলিও গ্যালিলি নেপচুন পর্যবেক্ষণকারী প্রথম জ্যোতির্বিদ হয়েছিলেন, যদিও তিনি ভালোভাবে স্থির নক্ষত্র হিসাবে এটি নির্ধারণ করতে পারেননি।
- বিজ্ঞানী জোহান্স রিডবার্গ ১৯১৯ সালের এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন।

২৯শ ডিসেম্বর

গণিতবিদ ব্রুক টেইলার ১৭৩১ সালের এই দিনে মারা যান। তিনি টেইলর সিরিজ বানানোর জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

৩০শ ডিসেম্বর

১৯২৪ সালের এইদিনে বিজ্ঞানী এডইউন হাবল ছায়াপথের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন।

৩১শ ডিসেম্বর

- Thomas Edison demonstrates incandescent lighting to the public for the first time.(1879)
- ১৬৯১ সালের এইদিনে কেমিস্ট রবার্ট বয়েল লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন ।

সময় যাত্রা

ফাহমিদ উদ্দিন আরিয়ান
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কলেজ
বুয়েট ক্যাম্পাস,ঢাকা।

৩ মে ২০৮৮

"স্যার? মে আই কাম ইন?"
"ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, মাইকেল!"
"দুঃখিত, স্যার। একটি জরুরি বিষয়ে কথা বলার ছিলো.."

চেয়ার ছেড়ে ঘুরে দাড়ালেন মি. কিয়াংহো।
চোখে-মুখে বিরক্তির আভা। দীর্ঘদিন ধরে টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে গবেষণা করছেন মি. কিয়াংহো। তার বানানো স্পেসশীপ মাত্র সাড়ে ৩ বছরে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের প্ল্যানেট নেপচুনে অবতরণ করেছে, যার সর্বোচ্চ গতি ছিলো সেকেন্ডে ৪৬ কি.মি।

"তোমার আবার কি জরুরি কথা?"
"স্যার? আমার মনে হয় আমি টাইম ট্র্যাভেলের ফর্মুলা বের করে ফেলেছি।"
"হোয়াট? আর ইউ ম্যাড!!"
"স্যার! আমি একদম ঠিক আছি, আপনি আমার কথা না শুনতে চাইলে আমি স্যার রিচার্ডসন এর সাথে এই ব্যাপারে কথা বলবো।"

কিয়াংহো উত্তেজিত হয়ে মাইকেলের হাত থেকে তার বানানো ফর্মুলাটি নিয়ে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর,
জোরে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন-
"মাই বয়!! এতোদিন ধরে পৃথিবীর নামি-দামি বিজ্ঞানীরা যা পারেনি তুমি তা পেরেছো!! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"
"স্যার, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমি এটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই এবং পৃথিবীর প্রথম মানব হিসেবে আমি টাইম ট্র্যাভেল করবো।"
"তা অবশ্যই। আমার বন্ধু জ্যাক কে সাথে নিয়ে আমরা ৩ জন পৃথিবীর প্রথম টাইম

ট্র্যাভেল মেশিন তৈরী করবো। আজকে থেকেই শুরু করে দিতে হবে।"
"কিন্তু!"
"কিন্তু কি?"
"স্যার, আমার তৈরী ফর্মুলা দিয়ে টাইম ট্র্যাভেল ঠিকই হবে। কিন্তু ফিরে আবার আসা যাবে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ। আর ফিরে না আসতে পারলে মৃত্যু নিশ্চিত।"
"ফিরে আসার জন্য তো তুমি একটা ফর্মুলা দিয়েছো, আর আমার গবেষণা বলছে অবশ্যই ফিরে আসা যাবে।"

মাইকেল কিছুটা হেঁটে গিয়ে স্যার কিয়াংহোর জানালার দিকে দাঁড়ালেন। অদূরের সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মাইকেল অস্ফুট স্বরে বললো-"কি সুন্দর দৃশ্য!"

১১ মে ২০৮৮

স্যার কিয়াংহো বেশ উৎফুল্ল। তাদের ফর্মুলানুযায়ী টাইম ট্র্যাভেলার বানানো শেষ। তিনি স্বপ্নে বিভোর, কেননা ইতিহাসে টাইম ট্র্যাভেলার এর ৩ জন উদ্ভাবকের মধ্যে তার নাম লেখা থাকবে। সিগেরেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাইকেলকে বললেন-
"মাইকেল?"
"জি স্যার?"
"তুমি চিন্তিত!"
সিগেরেটের বাক্সটা এগিয়ে নিয়ে বললেন-
"নাও। এইটা খুবই রেয়ার পিস, জার্মানি থেকে আনানো।"
মাইকেল সিগেরেটটা নিয়ে খেলো না, হাতেই রেখে দিলো।

"মাইকেল? হোয়াই আর ইউ লুকিং সো টেন্সড, মাই সান?"
"স্যার, আমি ফিরে আসবো তো?"

কিয়াংহো উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। বিদঘুটে হাসি...
"শোনো, তুমি ইম্পসিবল কে পসিবল করেছো। আমি আর জ্যাক দীর্ঘ দিন যাবৎ টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে গবেষণা করছি। তোমার ভয় নেই, তোমার সাথে আমরা কানেক্টেড থাকবো ওয়্যারলেস মডিউল দিয়ে। তুমি অযথাই..."

মাইকেল মানিব্যাগ থেকে তার মা'র ছবি বের করে তাকিয়ে আছে, অপালক দৃষ্টিতে।

"আচ্ছা? কিছু ঠিক করেছো, মাইকেল?"
"বুঝতে পারিনি।"
"কোথায় যাবে? কোন কালে যাবে?"
"জি, ঠিক করেছি। আমি আমার মাকে কখনো দেখতে পারিনি জন্মের পর। তাই অতীতে যাবো। আজ থেকে ২৪ বছর ৪ মাস আগে যাবো।"
"আমি তোমার জায়গায় থাকলে ভবিষ্যতে যেতাম।"
"বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম, মা নাকি এক্সিডেন্ট করে। তখন তার কোলে আমি ছিলাম।"
"আই এম সরি"

মাইকেলের থেকে তার মা'র ছবিটা হাতে নিয়ে কিয়াংহো অস্ফুট স্বরে বলে ফেললো- "বিউটিফুল লেডি।"
মাইকেল কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে স্যার কিয়াংহো থেকে ছবিটা নিয়ে নিলো।

"স্যার কিয়াংহো, আমি অতীত যাত্রা কবে করছি তাহলে?"
"১৬ মে"

মাইকেল কিছুটা চিন্তিত। তাকে তাড়া করছে তার মা'কে প্রথমবারের মতো দেখার এক অদ্ভুদ উত্তেজনা।

"স্যার, আজ আমি উঠি। আপনি মি. জ্যাকের সাথে শেষবারের মতো টাইম ট্র্যাভেলার পরীক্ষা করুন।"
"তুমি যেতে পারো, আমি আমার এসিস্ট্যান্ট রবো. এক্সকে বলছি তোমাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিবে।"
"ধন্যবাদ। আমি একা যেতে চাই। বিচে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো।"

মাইকেল বেশ চিন্তিত। অজানা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করেছে। আদৌ কি মানব ইতিহাসের প্রথম মানব হিসেবে মাইকেল অতীতে যাত্রা করতে পারবে?
মিশন সাকসেসফুল হবে তো?

পুরো পৃথিবীর অসংখ্য টিভি একসাথে সম্প্রচার শুরু করে দিয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে এক মাইকেলের দিকে।
শেষ পর্যন্ত কি তাহলে মানুষ পেরে গেলো, টাইম ট্র্যাভেল করতে?

মাইকেলকে স্যুট পড়িয়ে দেওয়া হলো, অসংখ্য সেন্সর তাকে আবৃত করে রেখেছে। কিয়াংহো বেশ উৎফুল্ল।

"আজকে মানবজাতির স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে তোমাকে দিয়ে। তোমার সাথে ক্যামেরা, ওয়্যারলেস মডিউল আছে। তুমি চাইলে অতীত থেকে কিছু আনতে পারবে না। আর হ্যাঁ, ঠিক ২৪ মিনিট থাকবে তোমার কাছে। আমরা তোমাকে এলার্ম করবো এখানে বসে। লেইট করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

মাইকেল হ্যাঁ/না কিছুই বললো না। নির্বিকার। স্যার কিয়াংহোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শুধু হাতটা মিলিয়ে সে আবদ্ধ টাইম ট্র্যাভেলারে উঠে গেলো। তার সঙ্গী তার মায়ের ছবিটা।

টেন, নাইন, এইট, সেভেন..........টু, ওয়ান!!!

ট্র্যাভেলার থেকে প্রকাণ্ড শব্দ হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সবকিছু শান্ত। কিয়াংহো সময় গুনছেন আর মাইকেল কে ট্রেস করছেন।

"মাইকেল এখন ২০৮০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর পার করছে!"
কিছুক্ষণ পর,
"আমরা খুব কাছাকাছি। টার্গেট অনুযায়ী আজকে থেকে ঠিক ২৪ বছর ৪ মাস আগে মাইকেল পৌঁছে গিয়েছে। সে এখন মোনাকো তে আছে।"

বিশ্বের সব টেলিভিশন দেখাচ্ছে মানুষের প্রথম টাইম ট্র্যাভেল যাত্রা।
"হ্যালো? মাইকেল? তোমার কাছে আর ১৭ মিনিট ২১ সেকেন্ড আছে।"
"স্যার, আমি দৌঁড়াচ্ছি। আশে পাশের মানুষ উদ্ভট চোখে তাকিয়ে আছে। আমি টার্গেট খুঁজছি, মোনাকো সিটি হসপিটাল।"
"তোমার জায়গা থেকে আর ৪৫ গজ দূরে আছে টার্গেট। ১৩ মিনিট ১২ সেকেন্ড আছে

আর।"
কিয়াংহোকে চিন্তিত দেখাচ্ছে প্রথমবারের মতো। কিয়াংহো সময় হিসাব করলেন আর ৮ মিনিটের মধ্যে মাইকেল ট্র্যাভেলারে না ফিরলে সব শেষ হয়ে যাবে।

"মাইকেল? আমি যা বলছি, শুনো। ইটস এ্যান অর্ডার। তুমি এখনই ট্র্যাভেলারে ফিরো। আর ৭ মিনিট তোমার কাছে।"
"স্যার!! মা'কে পেয়েছি। আমি পেয়েছি।"
"মাইকেল! তুমি পারবে না। এখনই ট্র্যাভেলারে ফিরে এসো।"

মাইকেলের মা অতীতে এক নবজাতককে কোলে পার্কিং লটে দাড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করে এক ট্রাক গতি হারিয়ে তার মা'র দিকে আসতে থাকে।

মাইকেল সুদূর অতীতে চোখের সামনে ঘটতে দেখছে এসব। মা'কে বাঁচাতেই হবে। সে দৌঁড়াতে থাকে তার মা'র দিকে। অনেক কাছে। মা তখন বুঝতে পারে সময় নেই আর, সাথে সাথে থাকা বাচ্চাটাকে দূরে সরিয়ে দেয়। ঠিক তখন মাইকেল তার মা'কে স্পর্শ করে।

সময় আর থাকে না। সেখানেই মৃত্যু হয় মাইকেলের।

"মাইকেল। তুমি কি আছো?"

"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মাইকেলের সাথে আমরা যোগাযোগ হারিয়েছি। আমরা ব্যার্থ।"

দীর্ঘ ৭ বছর পর কিয়াংহো রলিং চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো- "মাইকেলের সাথে কোন ভুল হয়নি তো?"

সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার নিজ ডাটাবেইসে খুঁজতে লাগলেন ২০৬৩ সালের আগস্ট মাসের দৈনিক খবর গুলো।

সাথে সাথে আঁতকে উঠলেন,
'মোনাকো সিটি হসপিটালে সংলগ্ন পার্কিং লটে এক মা'র ও এক অজ্ঞাতনামার ট্রাক চাপায় করুণ মৃত্যু'।

খবর পরে দেখলেন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির শরীরে অনেক সেন্সর পাওয়া গিয়েছিলো, যেসব ছিলো অনেক উন্নত। এমনকি যা আবিষ্কার ও হয়নি।

কিয়াংহো অবাক। তার মানে কি?

আমরা কোথায় আছি?
আমরাই কি বর্তমানে? নাকি কিয়াংহোর মতো আরেকজন সুদূর অতীতে বসে আরেক টাইম ট্র্যাভেলারের ছক কষছে। আরেকবার ভবিষ্যতের মাইকেল আসছে আমাদের সময়ে। কে জানে?

প্রশ্ন থেকেই যায়।
এই পৃথিবী অনেক বিস্ময়কর, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এক বিশাল এক গোলোক ধাঁধায় হয়তো আছি আমরা, কে জানে!

বিভিন্ন ধরনের কোমল পানীয় কি আমাদের স্বাস্থের জন্য ভালো?

নাহিদ আহমদ
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই বিভিন্ন ধরনের পানীয় পান করতে ভালোবাসি। আমরা কেন পৃথিবীর সব মানুষই বিভিন্ন ধরনের পানীয় পান করতে ভালোবাসে। এছাড়া এগুলো খাদ্য হজমে সহায়তা করে বলে মনে করেন । তবে এটা নিয়ে আজ কথা বলবো না। আমরা বেশিরভাগ মানুষই জানি না এগুলো আমাদের কেমন ক্ষতি করতে পারে। সবগুলো পানীয় কেমন ক্ষতি করে সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সবার পরিচিত কোকা কোলা কেমন ক্ষতি করে সেটা জানলে বুঝতে পারবেন এগুলো আমাদের কেমন ক্ষতি করে। তাহলে শুরু করা যাক একেবারে শেকড় থেকে।

কোকা কোলায় সাধারণত চিনি, কফিন, ফসফোরিক এসিড, caramel (এক ধরনের রং), কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি থাকে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উপাদান আমাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। WHO এর মতে প্রতিদিন ৬ চা চামচের বেশি চিনি সেবন করা উচিত নয় । অথচ, একটি ৩৩০ মি.লি ক্যানে (can) ৩৭ গ্রাম চিনি থাকে যা ১০ চা চামচ চিনি এর সমান। এখন বলবেন এতে চিনি থাকলে তো আমরা সাথে সাথে বমি হওয়ার কথা। কিন্তু কোলায় যে ফসফোরিক এসিড থাকে তা মিষ্টির পরিমাণ কমিয়ে দেয় যার ফলে বমি হয় না। কোলা সেবন করার ২০ মিনিটের মধ্যে আমাদের দেহে ইন্সুলিন (এক ধরনের হরমোন যা আমাদের দেহে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে) বিস্ফোরণ ঘটে। আর ইন্সুলিনের জন্য ডায়বেটিস হয়ে থাকে। যকৃৎ (কলিজা) তখন চিনিকে চর্বিতে রূপন্তরিত করতে থাকে। এতে শরীরে চর্বি বৃদ্ধি পায়।

কোকা কোলা সেবনের ৪০ মিনিটের মধ্যে আমাদের শরীর কফিন অবজারভ করে নেয়। আর ক্যাফেইন সাধারণত আমাদের ঘুমাতে দেয় না। ক্যাফেইন আমাদের ব্রেনের এডোনেসাইন রেসেপ্ট্রস কে ব্লক করে দেয়। যার ফলে আমাদের ঘুম আসে না। এছাড়া ক্যাফেইনের ফলে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। এর মাত্র ৫ মিনিটের মাথায় ডোপামিন নিঃসরণ শুরু হয়। ডোপামিন ব্রেনের এক টাইপের হরমোন যা আমাদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ এবং প্রেরণা দেয়। এতে এই হরমোন আমাদের বারবার কোলা সেবনের উৎসাহ দেয় যা মাদকের মতো কাজ করে। কোলা সেবনের ১ ঘন্টা পর শরীরের মধ্যে চিনির ক্রাশ শুরু হয়। এতে বিরক্তিবোধ এবং

ঘুমের ভাব আসে। এ সময় আমাদের শরীর পুষ্টিকর বিভিন্ন উপাদান কে প্রসাবের মাধ্যমে বের করে দেয়। কোকা কোলায় যে রং ব্যবহার করা হয় তা ক্যান্সারজনিত রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। যদিও তা খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া,২০১৮ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোকা কোলা সেবন করলে স্ট্রোক এর রিস্ক বেড়ে যায়, শিশুদের মনোযোগ কমে যায়।

২০১৬ সালের ইঁদুরের উপর এক গবেষণায় , কিডনি এবং লিভারের ক্ষতি হয় দেখা গেছে।
প্রতি বছর ১৮৪০০০ মানুষ মারা যায় কোমল পানীয় সেবনের কারণে।

যদিও আমরা এগুলো সেবন একেবারে ছেড়ে দিতে পারবো না। তবে আমাদের সবার উচিতে এগুলো পরিমাণ মতো সেবন করা।

চলো জাপান যাই !

জান্নাতুল ফেরদৌস মমো
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
ঢাকা।

অষ্টম শতাব্দীতে "নিপ্পন-কোকু"র মানুষেরা জলঘড়ি বানানো শিখে গেলো। সেই জলঘড়ি আবার নিজে নিজে চলে। জাপানের আরেক নাম হলো "নিপ্পন-কোকু" যার মানে হলো "দ্যা স্টেট অফ জাপান"।
এই সূর্যোদয়ের দেশে মুরাসাকি শিকিবু নামের একজন লেখিকা লিখে ফেললেন দুনিয়ার প্রথম উপন্যাস "The Tale of Genji"। শিল্প সাহিত্যের মাত্রা আরও এক ধাপ উপরে নিয়ে গেলো এই দেশের "জমন" নামে অভিহিত একদল যাযাবর মানুষ যারা মাটি দিয়ে অনবদ্য সুন্দর সব জিনিস গড়তে পারতো।
সতেরো শতাব্দীর মধ্যেই এই দেশের মানুষ বানিয়ে ফেলে মেকানিক্যাল পাপেট "কারাকুরি"। এই মেকানিক্যাল পাপেটগুলো নিজে নিজেই অভিনয় করতে কিংবা নাচতে পারতো। আর উনিশ শতকের মধ্যেই সারা বিশ্বে খাবার পরিবেশন থেকে শুরু করে তীর ছোঁড়া- প্রায় সব কাজের জন্যই জনপ্রিয় হয়ে গেলো এই কারাকুরি।

তাঁদের সতেরো শতকের "যুগের চেয়েও আধুনিক" মার্কা মেকানিক্যাল পাপেট "কারাকুরি" রোবটিক্স নিয়ে যাবতীয় গবেষণার টাইম লাইন পেরিয়ে অন্তত দশ রকমের ডাইমেনশন পেয়েছে। এই যেমন ধরো জাপানিজদের আছে হিউম্যান রোবট, ডোমেস্টিক রোবট, অ্যানিম্যাল রোবট, সোশ্যাল রোবট, রেসকিউ রোবট কিংবা মহাকাশচারী রোবটসহ আরও অনেক ধরনের জটিল সব রোবট।

Image: Hiroshima (広島), the culture of heritage

হ্যাঁ, বলছি সূর্যোদয়ের দেশ, বিশ্বের অন্যতম সভ্য ও উন্নত দেশ জাপান নিয়ে। এশীয়দের মধ্যে গবেষণা, পড়ালেখা ও নিত্যনতুন আবিষ্কার জাপানকে নিয়ে গেছে অন্যতম উচ্চতায়। জাপানে ২২ জন নোবেল বিজয়ী আছেন, যেটা সংখ্যায় এশিয়াতে সবচেয়ে বেশি। তার সাথে আরও অগণিত পুরস্কার ছিনিয়ে নেয়ার রেকর্ড তো আছেই।

১৫ মিলিয়ন বছর বয়সের দ্বীপপুঞ্জ আর ১০০,০০০ বছরের বর্ণিল ইতিহাসে সমৃদ্ধ জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ পেরিয়ে আজ বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি।

এই কঠোর পরিশ্রমের দেশ জাপানে যদি ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছা করে, অথবা দৃঢ় ইচ্ছা থাকে এবং ভাবো যে, “আমি জাপানে যাবোই”, তাহলে এটাই হবে তোমার জন্যে যুগোপযোগী ও ভালো সিদ্ধান্ত।

কিন্তু, জাপানেই কেন পড়তে যাবো?
যেকোন দেশে উচ্চশিক্ষা নেয়ার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। এখন তোমার প্রশ্ন আসতে পারে,”এতো দেশ রেখে জাপান ই কেন?” এর অনেক অনেক কারণ আছে। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলো দেখে নেয়া যাক!

ফোটন

হাই-স্ট্যান্ডার্ড জাপানঃ

জাপানের স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড OECD (Organisation of Economic Co operation and Develeopment) গবেষণার ফলাফল দেখলেই বুঝা যায়। স্কুলগুলোয় সারা বিশ্বে গণিত শেখায় জাপান র‍্যাংকিং এ ১ম, আর বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার জন্যে ২য়। জাপানে প্রায় ৭০০'র মতো বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ভালো মানের পড়ালেখা ও গবেষণা হয়। QS Ranking এ প্রথম ৫০ টা ইউনিভার্সিটির মধ্যে আছে জাপানের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'The University of Tokyo' এবং 'Kyoto University' । সেরা ৫০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে জাপানেই কেবল ১৬ টি (ARWU).

জাপানিজ ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং সম্পর্কে আরও ভালো জানতে চাইলে এই লিংকে যেতে পারো।

লিংকঃ https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

এতো সামান্য পরিসংখ্যান মাত্র। জাপানে তুমি প্রায়ই সব বিষয় নিয়েই পড়ালেখা করতে পারবে। কিন্তু, তুমি যদি ন্যানো টেকনোলজি, রোবোটিক্স, Artificial Intelligence, কম্পিউটার সায়েন্স ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আগ্রহী থাকো, তাহলে জাপানের 'হাই স্ট্যান্ডার্ড' ইউনিভার্সিটিগুলো তোমাকে 'হাই স্ট্যান্ডার্ড' করে গড়ে তুলবে।

Image: The University of Tokyo (東京大学)

নিরাপত্তা নিয়ে 'নো টেনশন':

জাপান বিশ্বের নিরাপদ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভায়োলেন্স, হত্যাকান্ড নেই বললেই চলে। নিরাপদ দেশের তালিকায় জাপান সবসময় শীর্ষে অবস্থান করে। তাই নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকলে সেটা ঝেড়ে ফেলে দাও, যদি তোমার চয়েজ জাপানই হয়। রোডের মোড়ে মোড়ে পুলিশ বক্স, ট্রাফিক সিস্টেম তোমাকে অবাক করে দিবে!

জাপানিজ মার্শাল আর্ট আর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি থেকে শেখার সুযোগঃ

Image: Karate (空手)

জাপানিজ ভাষা থেকে শুরু করে জাপানিজ মার্শাল আর্ট- জাপানের কালচার এর প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষালাভ করার সুযোগ রয়েছে জাপানে। আর সেই সুযোগ দিচ্ছে প্রায় জাপানের প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটি। আবারো একটি ছোট পরিসংখ্যান দেই। সামার অলিম্পিকে জাপানের মেডেল সংখ্যা হচ্ছে ৪৩৯ আর উইন্টার অলিম্পিকে সংখ্যাটি ৫৮। ইউনিভার্সিটি অফ ৎসুকুবা এই পর্যন্ত তাদের প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থীকে এথলেট হিসেবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। আর রিও অলিম্পিক ২০১৬ তে জাপানের টোকাই ইউনিভার্সিটির ৩ জন শিক্ষার্থী পেয়েছে গোল্ড মেডেল। তারা প্রায় প্রত্যেকেই ভার্সিটির জুডো, কেন্ডো, কাইউডো কিংবা কারাতে ক্লাব থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এছাড়াও তাইকো ড্রামিং, শা মিসেন (ট্র্যাডিশনাল জাপানিজ বাদ্যযন্ত্র) জাপানিজ ক্যালিগ্রাফি, চা উৎসবের মতো অনেক রকমের জাপানি সংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে জাপান কখনই কার্পণ্যবোধ করেনা।

অদ্ভুত স্বাদের সুশি কিংবা জাপানের মন ভোলানো আর্কিটেকচার ছাড়াও জাপানের সভ্যতার প্রায় প্রতিটি উপাদান তোমাকে পড়াশোনার জন্য “জাপান মুখী” করে ফেলতে পারে। বিশ্বাস না হলে এই লিঙ্কটিতে ঘুরে আসতে পারো!

লিঙ্কঃ https://www.japan-talk.com/jt/new/japan-culture

জাপানের “ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস” গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে ঘুরে আস্তে পারো এই লিঙ্কে।

লিঙ্কঃ https://www.japan-guide.com/e/e2251.html

Image: Sushi, Japanese Traditional Food (寿司)

আরও আছে বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত আর শীত- জাপানের এই চার ঋতুর অনবদ্য সুন্দর সব দৃশ্য। পড়াশোনার পাশাপাশি জাপানের “ন্যাচার আর কালচার” থেকে প্রাপ্ত এমন সব অভিজ্ঞতা তোমার জ্ঞানের পরিসীমাকে আরও বহু গুনে বাড়িয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

“ কিন্তু টিউশন ফি এর অঙ্কটা কেমন?”

এই বিশাল চিন্তার ক্ষেত্রেও জাপান তোমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিচ্ছে। ইউনাইটেড কিংডম কিংবা ইউএসএ, এই সব লুক্রেটিভ জায়গায় পড়াশোনার খরচ মেটাতে হিমশিম খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে জাপান তোমাকে দেবে “সাধ্যের মধ্যে সবটুকু সুখ”। ইউকে কিংবা ইউএসএতে প্রতিবছর টিউশন ফি যেখানে প্রায় ১০ থেকে

১১ হাজার ডলার ছাড়িয়ে যায়, সেখানে জাপান বিশ্বমানের পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে এর অর্ধেকেই। অঙ্কে বললে বার্ষিক ৫,৫০০ ডলারের মধ্যেই টিউশন ফি এর ব্যপারটি জাপানে সেরে ফেলা যায়।

মেডিকেল কেয়ার নিয়ে টেনশন নেইঃ

একটি চমকপ্রদ তথ্য দেই। অন্যান্য দেশে মেডিসিন কিংবা চিকিৎসার ব্যাপারে বিদেশি শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও বিপাকে পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে জাপান দিচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ! বিদেশি শিক্ষার্থীরা ন্যাশনাল হেলথ ইন্সুরেন্স প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত হলে সব ধরনের মেডিক্যাল খরচাপাতির মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীরা বহন করবে। বাকি সব ধরনের খরচ বহন করবে ইন্সুরেন্স।

ইউএসএ কিংবা বিশ্বের অন্যান্য জায়গার প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সিস্টেম থেকে জাপানের হেলথ ইন্সুরেন্স সিস্টেম হাজার গুনে সাপোর্টিভ।

ওল্ড বয় ভিজিট:

“ওবি হউমন (OB HOUMON)” বলতে জাপানে বুঝানো হয় “ওল্ড বয় ভিজিট”। কিন্তু এই ওল্ড বয় কারা?

ওল্ড বয় হচ্ছে ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন সব শিক্ষার্থী, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় “Alumni”। গ্রাজুয়েশনের পড়ে যখন চাকুরি খোঁজার পর্ব শুরু হয় তখন ওল্ড বয়েজরা নিজ নিজ ইউনিভার্সিটির সবে মাত্র পাশ করে বের হওয়া প্রাক্তনদের সাথে ক্যারিয়ার সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করে থাকেন। অনেকে আবার নিজ নিজ কোম্পানির হিউম্যান

রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট আর নিজের ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগসাজশ তৈরি করে দেন। এতে করে গ্রাজুয়েশনের পরে চাকরির জন্য দৌড়ঝাঁপের পর্বটা আরও সহজ এবং ইফেক্টিভ হয়।
এমন হেল্পফুল ওল্ড বয়েজের ট্র্যাডিশন জাপানের ইউনিক বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে অন্যতম।

এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটির জন্য সার্কেল:

ধরো কোনো এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটি যেমন মিউজিক, আর্ট, সাইক্লিং কিংবা পেইন্টিং তোমার খুবই ভালো লাগে। এক্ষেত্রে জাপানে খুবই অসাধারণ একটি ট্র্যাডিশন রয়েছে। যারা পড়াশোনার পাশাপাশি মিউজিক নিয়ে আগ্রহী তারা কয়েকজন মিলে তৈরি করে ফেলে একটি মিউজিক সার্কেল। এই রকম আরও আছে পেইন্টিং সার্কেল, সাইক্লিং সার্কেল সহ আরও অনেক রকমের সার্কেল। সার্কেলের শিক্ষার্থীরা একে অপরকে নিজের ইন্টারেস্টের জায়গায় তুখোড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

এত গেলো জাপান নিয়ে অনেক অনেক গল্প। ইতোমধ্যে তোমাদের হয়তো অনেক আগ্রহী হয়ে গেছো জাপান সম্পর্কে। এবার তাহলে জেনে নিই কিভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন ও নিজেকে প্রস্তুত করবে।

Image: Ritsumeikan University

ফোটন

জাপানে স্কলারশিপ:

জাপানে মূলত নিম্নোক্ত স্কলারশিপে আসা যায়

১. MEXT স্কলারশিপ: MEXT scholarship এর জন্য দুইভাবে আবেদন করা যায়।

ক) জাপান এম্বাসি বাংলাদেশ এর মাধ্যমে: আবেদনের সময় প্রতি বছরের মে মাসে জাতীয় পত্রিকায় আবেদন ডাকা হয়। সীমিত সংখ্যক স্কলারশিপ।
লিঙ্ক: https://www.bd.emb-japan.go.jp/en/education/scholarshipNotice.html

খ) জাপানিজ ভার্সিটির মাধ্যমে: আবেদনের সময় ১ নভেম্বরের থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ভার্সিটি রিকমেন্ডেশনের মাধ্যমে সুযোগ ও স্কলারশিপের সংখ্যাও অনেক বেশী। ২০১৮ সালে ২৬৭ জন বাংলাদেশি MEXT scholarship পায় ।
২. ADB স্কলারশিপ: এইখানে জিপিএ এর চাইতে বেশি দরকার ২ বছর অভিজ্ঞতা। যাদের পাশ করার পর দুইবছর জব এক্সপেরিয়েন্স নাই তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেনা । আর আপ্লিকেশনের তারিখ ভার্সিটির উপর নির্ভর করে।
লিঙ্ক: https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/-jsp-institutions
৩. World Bank স্কলারশিপ: আপ্লিকেশনের সময় সাধারণত প্রতি বছরের মার্চ মাসে।
লিঙ্ক: http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#3

ভার্সিটি সিলেকশন:

জাপানের সব ভার্সিটিতেই পড়াশুনার সিস্টেম একই। তবে স্কলারশিপের জন্য পাবলিক ভার্সিটি ও ন্যাশনাল ভার্সিটি সিলেক্ট করাই উত্তম। কারণ এইসব ভার্সিটিতে স্কলারশিপ এর সংখ্যা সাধারণত বেশি থাকে। তাই গুগলে List of Public University / National university in Japan লিখে সার্চ দিলেই সব ভার্সিটি পাওয়া যাবে। সব ভার্সিটির ওয়েব পেইজ জাপান, কোরিয়ান, চাইনিজ ও ইংরেজিতে লিখা।
লিঙ্ক: http://www.mext.go.jp/en/about/relatedsites/title01/detail01/sdetail01/1375122.htm
ইমেইল:
এক্ষেত্রে শুধু ল্যাবের প্রধানকে ইমেইল করলে সবচেয়ে ভালো হবে। যদি প্রফেসর না থাকে তাহলে এসোসিয়েট প্রফেসরকে ইমেইল করবে। MEXT স্কলারশিপের জন্য আবেদন শুরু ২-৩ মাস পূর্বে থেকেই প্রফেসরদের ইমেইল করা ভাল। কারণ জাপানিজ কোন প্রফেসর যদি একজনকে এপ্লাই করতে বলে তাহলে অন্য কাউকে আর এই সুযোগ দিবে না। মানে অন্য কেউ ইমেইল দিলে রিপ্লাইয়ে বলে দিবে সে

ফোটন

একজনকে এপ্লাই করতে বলেছে। তাই ই-মেইলের মাধ্যমে কমপক্ষে পাঁচ জন প্রফেসরকে ম্যানেজ করে পাঁচটি ভার্সিটিতে এপ্লাই করতে হবে। তবে, তুমি ৩ টা ভার্সিটি থেকে সিলেক্ট হলেও ফাইনাল আপ্লিকেশন (বরাবর জাপান মিনিস্ট্রি) একটাই করতে পারবে। মানে বাকি দুইটা তোমাকে বাদ দিতে হবে।
ই-মেইলের তোমার Academic Transcript ও Curriculum Vitae অবশ্যই যুক্ত করবে। আর ই-মেইলে Self- Introduction, Academic Degree, Result, Research Interest and Why you interest to him (Professor) সম্পর্কে ২০০-২২০ শব্দের মধ্যে লিখলেই ভাল।
লিঙ্কঃ https://drive.google.com/file/d/1IGG8QkJE_GgVopp-rX-AQI6O3HueoWrEn/view?usp=sharing

আবেদনের খরচ:
জাপানে কোন ভার্সিটিতে এপ্লাই করতে কোন এপ্লিকেশন ফি লাগেনা। তাই আমি বলব কমপক্ষে ৫টি ভার্সিটিতে এপ্লাই করতে ।
আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:

১. আবেদনপত্র: জাপানের সব ইউনিভার্সিটিতে MEXT এর আবেদনদের ফর্ম সাধারণত একটাই। যেটা জাপান সরকারের প্রদত্ত ফর্মেট হতে পারে। তাই একই এপ্লিকেশনে দিয়ে সব জায়গায় এপ্লাই করা যায়। তবে গুটিকয় ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন এপ্লিকেশন সিস্টেম আছে। যেমন দ্যা ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রফেসর নিজেই বলবে দিবে তোমাকে কি করতে হবে আর কিভাবে এপ্লাই করতে হবে আর কি কি ডকুমেন্ট কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

২. রিকমেন্ডেশন লেটার: স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য রিকমেন্ডেশন একটা গুরুপুর্ন অংশ। সব ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটেই এই ফরম আপলোড করা থাকে। এই ফরমের সাথে ইচ্ছা করলে নিজের লিখা পেপারও যুক্ত করতে পারবে। তবে কার কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন নিতে হবে সেইটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ইউনিভার্সিটির রিকমেন্ডেশন লেটারে বলা হয়ে থাকে, ডিন বা প্রফেসর সমপর্যায়ের ব্যক্তি হতে হবে। এবং রিকমেন্ডেশন লেটার লিখতে হয় “ বরাবর প্রেসিডেন্ট (জাপানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম)। তবে কিছু কিছু ভার্সিটির ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাই আমি বলব ডিন বা প্রফেসর হতে সবসময় রিকমেন্ডেশন লেটার সংগ্রহ করতে।
তাছাড়া তোমার রেস্পেক্টিভ সুপারভাইজার ও তোমার জন্য এডমিশন কমিটির কাছে তোমার জন্য রিকমেন্ডেশন লেটার লিখবে। এই দুই রিকমেন্ডেশন লেটার আপ্লিকেন্ট সিলেকশনের জন্য খুব বড় ফ্যাক্টর।

৩.রিসার্চ প্রপোজাল:জাপানের সব ইউনিভার্সিটির রিসার্চ প্রপোজালের ফর্ম একটাই। সর্বোচ্চ দুই পেইজ। এইটা লিখার জন্য খুব ক্রিটিক্যাল হবার কিছুই নাই। তবে যে বিষয়ে তোমার পড়ার ইচ্ছে ওইটা ভালোভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে। কিছু প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমেই তুমি সেইটা গুছিয়ে লিখতে পার। যেমন:

ক) যে টপিকের উপর তুমি পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক সেইটা পরিষ্কার? তাহলে টপিকের একটা টাইটেল নির্ধারণ কর।

খ) এইবার এই টপিকের সম্পর্কে তুমি যা জান তা লিখ যাকে আমরা Introduction বলি। প্রয়োজন হলে গুগলের হেল্প নাও।

গ) এইবার সেই টপিকের উপর কিছু কাজ খুঁজে বের কর (গুগল থেকে)। ২-৩ টা পেপার ডাউন-লোড করে একটু পড়। শুধু টপিক আর কোন মেথড আপ্পলাই করেছে আর কি ফলাফল পেয়েছে তা একটু বুঝার জন্য। খুব ডিটেল পড়ার প্রয়োজন নাই। পরিশেষে তিনটা পেপারের উপর একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করি (যাকে আমরা Back-ground বা Literature Review বলি)।

ঘ) এইবার লিখ, তুমি কেন এই টপিকটা পছন্দ করেছ, তার উপর কয়েকটা লাইন (Objective ও Significance)।

ঙ) কাজটা তুমি কিভাবে করবে? Numerical না Experimental Study সেই সম্পর্কে ৩-৪ লাইন লিখ। যদি কোন Working ডায়াগ্রাম থাকে তাহলে যুক্ত করতে পার।
চ) এই কাজ শেষে তুমি কি আউটপুট (সম্ভাব্য) পাবে? সেই বিষয়ের কিছু লাইন লিখ।

ছ) পরিশেষে একটা উপসংহার।
তবে প্রপোজাল লিখার জন্যে প্রফেসরকে তার পেপারের জন্য বলতে পার। প্রফেসর তোমাকে ই-মেইলে বা DHL-এ পাঁঠিয়ে দিবে। আমি নিজেও ২ বার DHL এর মাধ্যমে অনেক পেপার পেয়েছি।

লিঙ্ক: https://drive.google.com/file/d/1k1enlhF5BlmlG6ddvI7dsd2yVX-2S4vwp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14e2-lkUjJrSca3vc7bY-OhPnh_K8z3rKd/view?usp=sharing

৪. ইংরেজির দক্ষতা: জাপানের ভার্সিটি-গুলোতে সাধারণত ইংরেজির দক্ষতার জন্য কোন IELTS লাগেনা। তবে কিছু ভার্সিটিতে উল্লেখ থাকলেও তার গুরুত্ব খুবই কম। Medium of Instruction in English দিয়েই এপ্লাই করতে পারবে।
৫. পাবলিকেশন: পৃথিবীর সব ভার্সিটিতেই এপ্লিকেশন যাচাইয়ের সময় এইটা প্রধান্য দেওয়া হয়। আমি মনে করি, এপ্লাই করার পূর্বে কমপক্ষে একটা কনফারেন্স পেপার হলেও থাকা ভাল। সেইটা যেইখানেই পাবলিশ হউক না কেন। কারণ এইটা দিয়ে যাচাই হয় আবেদনকারীর রিসার্চ ও পেপার লিখার সক্ষমতা আছে কি নাই। সব পাবলিকেশনের প্রথম পেইজ (Abstract Page) আপ্লিকেশন ডকুমেন্টের সাথে যুক্ত কর।

৬. Academic ডকুমেন্টঃ University মাধ্যমে সত্যায়িত Undergraduate certificate, Transcript and Medium of Instruction in English, Degree Completion Certificate (কিছু ভার্সিটিতে প্রয়োজন)
৭. Passport এর কপি। পাসপোর্ট না থাকলে National ID দিয়েও করতে পারবে। তবে ভার্সিটির মাধ্যমে সিলেকশনের সাথে সাথে পাসপোর্ট-এর কপি দিতে হবে।
৮. রেজাল্ট: শুধু জাপানে নয়, যেকোনো দেশেই সরকারী বা প্রাইভেট স্কলারশিপ অনেক প্রতিযোগিতা-মুলুক। কারণ এইখানে সিলেকশন হয় একটি কমিটির মাধ্যমে যারা সকল এপ্লিকেন্টের সব ক্রাইটেরিয়ার উপর স্কোরিং করে। তাই যাদের সিজিপিএ ৩.৩০ বা অধিক তাদেরকে বলব MEXT, ADB ও WB এপ্লাই করতে ।
৯. নিজ খরচে পড়াশুনা করা যাবে?
জাপানে ইন্টারন্যাশনাল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ৫০% এর বেশিই হবে চাইনিজ। এদের বেশিরভাগই জাপানে পড়তে আসে নিজ খরচে। জাপানে টিউশন ফি ৬৫০০-৮০০০ ইউএসডি। যদি প্রফেসর টিউশন ফি ওয়েব করতে পারে সেই ক্ষেত্রে জাপানে পড়াশুনা করতে আসলে কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কারণ, পড়াশুনার পাশাপাশি মাসে ১২৮ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি থাকে যার মাধ্যমে ১২৮০০০ জাপানিজ ইয়েন ইনকাম করতে পারবে। টোকিও-তে ভালোভাবে তা দিয়ে চলতে পারবে আর অন্য কোথাও হলে মাসে ৭০-৮০ হাজার ইয়েনে চলতে পারবে। তবে বাইরে জব করতে চাইলে জাপানিজ ভাষা বলা অবশ্যই জানতে হবে। তবে কারো যদি ভবিষ্যতে জাপানে চাকুরী ও জব করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি বলব জাপানিজ ভাষার প্রাইমারী লেভেল N5 ও N4 শেষ করে আসতে। ইন্টারন্যাশনালদের জন্যে কাজের অনেক সুযোগ রয়েছে বিশেষ করে যারা জাপানিজ বলতে পারে।
তাছাড়া জাপানে অনেক প্রাইভেট স্কলারশিপ আছে যা শুধুমাত্র ভর্তি-কৃত International ছাত্রছাত্রীদের জন্য ।
লিঙ্ক: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/__icsFiles/afieldfile/2018/06/26/scholarships_2018_e.pdf
১০. ভাইবা: আবেদন করার পর প্রফেসর স্কাইপির মাধ্যমে ভাইবার জন্য তোমাকে বলবে। তবে ভাইবা খুবই সিম্পল। ভাইবাটাকে আমি বলব শুধু একটা পরিচিতি পর্ব। শুরুতেই তোমাকে তোমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। তারপর তুমি কেন জাপানে পড়তে ইচ্ছুক সেই সম্পর্কে কিছু কথা বলবে। এরপর তোমাকে তোমার প্রপোজাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। আর প্রফেসর যেই বিষয় নিয়ে কাজ করে আর সম্পর্কে কিছু জেনে রাখা ভাল। শুধু বেসিক কথাবার্তা। তবে এতে নার্ভাসের কিছুই নাই। সব মিলিয়ে মাস্টার্সের জন্য ১৫-২০ মিনিট আর পিএইচডি জন্য ২০-৪০ মিনিট কথাবার্তা হবে।
***জাপানে Masters না করে PhD-তে যাওয়া সম্ভব না। তাই Master's Degree থাকলে PhD -এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে।

জাপানে যাওয়ার অনেক কারণ তো বললাম। সাথে প্রসিডিউরও বলে দিলাম। এখন, আমার মতো যাদের স্বপ্ন জাপানে উচ্চশিক্ষা নেয়া, গবেষণা করা, তাহলে এই ইচ্ছাই ঘুরিয়ে দিতে পারে জীবনের মোড়। এ পথ শুনতে যতটা সোজা, বাস্তবে ততটাই কঠিন। তাই, এই বন্ধুর পথকে মসৃণ করতেই হবে ইনশাআল্লাহ। আজই বই-খাতা নিয়ে বসে পড়ি চলো!!!

স্বপ্ন যে পূরণ করতেই হবে!

ছবিঃ Japan Street Night wallpaper

রেফারেন্সঃ
১। https://blog.10minuteschool.com/study-in-japan/
২। https://www.cuetnews24.com/

অন্তিম সময়

মোঃ জায়েদ খান
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ,
টাঙ্গাইল।

সাল ২১২০

টিউব ট্রেনে করে হেড অফিসে যাচ্ছে তানজিল। যদিও তার নিজস্ব গাড়ি আছে। তবুও সে ট্রেনে করেই যাচ্ছে। ট্রেনে চড়ার অভ্যাস টা সে তার বাবার থেকে পেয়েছে। আজ সে ট্রেনে করে যাচ্ছে কারণ এটাই হয়তো তার শেষ ট্রেনযাত্রা,হেড অফিস থেকে তাকে মেসেজ দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনে জানালা নেই। নাহলে সে দেখতে পেত বাইরের বিভীষিকাময় অবস্থা টা। অবশ্য সে এসব জানে। পৃথিবী তার অন্তিম সময়ে এসে পৌঁছেছে। "এর কারণ অবশ্য আমরা মানুষরাই", মনে মনে বলল তানজিল।

গত কয়েক দশকে বলতে গেলে আরেকটা শিল্প বিপ্লব ই হয়েছে। মানব সভ্যতা পেয়েছে আরো অভাবনীয় প্রযুক্তি। তবে এর অতিরিক্ত আর অপব্যবহারের ফলে এখন নিজেদের অস্তিত্বকেই সংকটে ফেলে দিয়েছে তারা। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা যেসব প্রেডিকশন করেছিলেন,তার বেশিরভাগই এখন সংঘটিত হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র উপকূলীয় বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ অঞ্চল সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছে। এই যে সে এখন ট্রেনে বসে রয়েছে, ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারছে কারণ ট্রেনে অক্সিজেনের সাপ্লাই দেওয়া আছে। কিন্তু বাইরে যারা মুক্ত পরিবেশে রয়েছে তাদের অবস্থা শোচনীয়। যারা ধনী তারা শুধু অক্সিজেন মাস্ক পড়ে তাদের দৈনন্দিন কাজ করছে। তবে এসব কতদিন চলবে সে তা জানে না।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থান যোগাতে বনের পর বন কেটে সাফ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হয়েছে। পুরো বিশ্ব এখন অক্সিজেন স্বল্পতায় ভুগছে।

পুরো বিশ্বে অনেকের হয়তো ৫০-৭০ বছর আগের বিশ্বের কথা মনে হতে পারে। না। সে অবস্থা এখন আর নেই। গত শতাব্দীর শেষের দিকের যুদ্ধে পৃথিবীর অর্ধেক জনপদ

খালি হয়ে যায়। এতো বিশাল ক্ষতিটা শুধু মানবজাতির একার হয় নি। হয়েছে পুরো প্রাণীজগতের আর প্রকৃতির। তিনটে পারমাণবিক বোমা ফেলার কারণে সেসব স্থানে এখন কোনো প্রাণীর ই অস্তিত্ব নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতা আর টাকার কাছে মানুষ হার মেনেছে বরাবরই। এই যুদ্ধ সেটাই প্রমাণ করেছে।

ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছানোর কারণে তার চিন্তায় ছেদ ঘটলো। ট্রেন থেকে নামার আগে অক্সিজেন মাস্কটা পরে নিলো সে।

হেড অফিসের নিচে এসে লিফটে উঠলো সে। মুখে বললো, " তানজিল রহমান, জুনিয়র এস্ট্রোনট, আইডি নং ৭৭৫৭৬। "

স্বয়ংক্রিয় আওয়াজ আসলো, 'আপনার ডান চোখ সামনের রেটিনা স্ক্যানারে রাখুন। '

কতকগুলো বিপ-বিপ শব্দ হওয়ার পর আবার আওয়াজ আসলো, ' ধন্যবাদ,আপনার ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে '।

বাটনে ৩০ চাপলো সে। কয়েক সেকেন্ড পর নিজেকে ৩০ তলায় আবিষ্কার করলো সে। টেলিপোর্টেশন। মানুষের আবিষ্কৃত অভাবনীয় প্রযুক্তি গুলোর মধ্যে একটা। তবে এটা খুব সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হয়। সবাই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। শুধু তাদের হেড অফিসের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এখন তাদের হেড ড.ক্রিস্টোফার এর কক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। একটু ইতস্তত করে ঢুকেই পড়লো।

'স্যার আসতে পারি'?

'হ্যাঁ,তানজিল। আসো। ' বললেন এনএসএ এর হেড।

'তোমাকে মেসেজ দেওয়া হয়েছে। আমি তারপরও আবার বলছি,তুমি জানো যে পৃথিবী এখন খুব সংকটের মধ্যে আছে। পৃথিবীর অর্ধেক জায়গা বসতির অনুপোযুক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক এলাকা তলিয়ে গেছে সমুদ্রে। পরিবেশ ও দিন-দিন আমাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। এর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ আর আমরা নিজেরা দায়ী। নিজেদের বাসস্থান কে আমরা নিজ হাতে ধ্বংস করেছি। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন মাত্র ২০ কোটি। গত শতকের শুরু দিকে যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিলো বর্তমানের চেয়ে

৩৫ গুন বেশি! ভাবতে পারো!!

নিঃশ্বাস ছাড়লো তানজিল। হ্যাঁ, সে এটা জানে। যুদ্ধ, মহামারী,প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মারা গেছে অসংখ্য মানুষ। এদের বেশিরভাগই মারা গিয়েছে পারমাণবিক বোমার আঘাতে।

'শোন তানজিল',বলতে শুরু করলেন ক্রিস্টোফার, 'এখন যে জনসংখ্যা এটিও খুব বেশিদিন থাকবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। সেসব দেশের সরকারের কাছে এর কোনো সল্যুশন নেই। আইন-শৃঙ্খলার অভাব থাকায় বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠছে সশস্ত্র সংগঠন। পৃথিবীর ধ্বংস খুব নিকটে। তাই গভর্মেন্ট থেকে ৫০০

জনের একটা টিম করা হয়েছে যাদের পাঠানো হবে পৃথিবীর বাইরে সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহ বিইউকে৫৬ তে। আর এটা খুব গোপন একটা মিশন। জনসাধারণ থেকে গোপন করে । কারণ এখন পৃথিবীতে এমনি সব কিছুর সংকট। তার উপর তারা যদি জানে এতো টাকা খরচ করে তোমাদের স্পেসে পাঠানো হচ্ছে তাহলে একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে। তাই খুব গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজটা করা হচ্ছে। ' একনাগাড়ে বলে গেলেন ক্রিস্টোফার। সব মনোযোগ দিয়ে শুনেছে তানজিল। একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলেন ক্রিস্টোফার,' তোমাদের ১০ জনের নেতৃত্বে ৫০০ জন ও আরো ২০০ ফিটাস পাঠানো হবে। সাথে আরো বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা আর বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখির ফিটাস। "

এটুকু বলে নিজের পরিহিত চশমা থেকে তানজিলের চশমার উপর সরু একটা আলো ফেললেন তিনি।

একটু পর নিজের চশমায় তাদের মিশন সম্পর্কিত ডিটেইলস দেখতে পেলো সে।

"এখানে সব ডিটেইলস আছে। তুমি ভালো করে দেখে নাও। তোমার ক্রুমেট কারা দেখে নাও। "

"জ্বি স্যার, আমি তাহলে আসি? "

"আচ্ছা যাও,কাল তোমাদের লঞ্চ ডে। সৌরজগতের শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে। তারপর হয়ত অসুবিধা হতে পারে। মনে রেখো,যেখানে যাচ্ছো সেখান থেকে ফিরে আসার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই। "

এটা জানে তানজিল। নিজেকে সে এভাবেই প্রস্তুত করেছে। পৃথিবীর প্রতি তার মায়া শেষ। তাছাড়া পৃথিবীতে তার আপন কেউ নেই এখন যার জন্য সে থেকে যাবে। যাওয়ার আগে বাবার সমাধিটা একবার দেখে যাবে সে। তার মার সমাধি কোথায় সেটা সে নিজেও জানে না। এমনি তার বাবাও জানে না।

যুদ্ধে মেডিকেল অফিসার হিসেবে গিয়েছিলো সে। পরে তার লাশ আর পাওয়া যায়নি।

স্যারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলো সে।

প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক দ্বীপ

সাগরের বেলাভূমিতে খেলা করছে দুটি শিশু। তাদের পরনে পশমের কাপড়। হঠাৎ খেলা থামিয়ে দিলো তারা। আকাশের দিকে কি যেন একটা দেখতে পেয়েছে তারা। খুব দ্রুত উপরে উঠে যাচ্ছে একটা কিছু।

একটু দূরে গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ। সেখানে বসেই জিনিসটা দেখতে পেলেন। বুঝতে পারলেন সেটা স্পেসশিপ।

১০ বছর আগে যখন ন্যাশনাল স্পেশ এডমিনিস্ট্রেশন এর প্রধান ছিলেন, তখন থেকেই এটার পরিকল্পনা চলছিলো। তবে এর বিপক্ষে ছিলেন তিনি। এই স্পেসশিপ তৈরিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে তা চিন্তারও বাইরে। এতো এতো পরিমাণ অর্থ দিয়ে স্পেসশিপ না বানিয়ে তা দিয়ে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশ স্বাভাবিক রাখা যেত। যেদিন সরকার থেকে এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসে সেদিনই তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই প্রোজেক্টের বিরোধিতার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

পৃথিবীর বর্তমান যে পরিবেশ সেখানে টিকে থাকা দায়। প্রতি মুহুর্তে মানুষ মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে।

তিনি সেদিনই ঠিক করেছিলেন, এখানে আর থাকবেন না। প্রশান্ত মহাসাগরে মাঝারি আকারের একটা দ্বীপ কিনে রেখেছিলেন তিনি। সংকায় ছিলেন যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ার ফলে সেটি ডুবে যাবে কিনা। আশ্চর্যজনকভাবে সেটি এখনো ডুবেনি। তার আশা ভবিষ্যতেও ডুববে না।

নিজের পরিবার আর কিছু আত্নীয়-স্বজনসহ কিছু অসহায় মানুষদের নিয়ে ১০ বছর আগে এই দ্বীপে এসেছিলেন তিনি। দ্বীপে মোট মানুষের সংখ্যা ১৬। বাচ্চা বলতে তার দুই নাতি যারা এখনো বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

স্পেসশিপের কন্ট্রোলরুমে বসে আছে তানজিল। গ্র্যাভিটি মোড অফ করা, তাই স্বাচ্ছন্দ্যে নড়াচড়া করতে পারছে। তার সাথে আরো দুইজন বসে আছে। এছাড়া আরো ৭ জন আছে যারা এখন স্পেসশিপের বিভিন্ন ইউনিটে তাদের কাজ করছে। তাদের তিনজন আর কিছুক্ষণ এটা কন্ট্রোল করবে। তারপর ডেস্টিনেশন সেট করে দিয়ে তারা যাবে শীতনিদ্রায়। ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুল গুলো তৈরি করা হচ্ছে। একটু পরই হয়তো সময় এসে যাবে। বসে বসে পুরনো কথা গুলো ভাবছে তানজিল। কত স্মৃতি ছেড়ে যাচ্ছে পেছনে! আর কোনো দিন ফিরে আসতে পারবে না।

যদিও তার পৃথিবীর প্রতি মায়া উঠে গেছে তাও মনের এক কোনায় এখনো তার

জন্মভূমিকে ভালোবাসে সে। এখন সেটা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে।

পাশের দুজনের কথাবার্তায় চিন্তায় ছেদ পড়লো তার। ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুলে ঢোকার সময় এসে গেছে। একবার ঘুমালে জানে না কবে উঠবে ঘুম থেকে। হয়তো ১০০-২০০ বছর কিংবা তারও বেশি বছর পেরিয়ে যেতে পারে। ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুল ছাড়া এ যাত্রা অসম্ভব ছিলো।

কন্ট্রোলার মডিউল টাকে অটোতে সেট করে দিলো সে। বাকিরাও তাই করলো। সবাই এখন যার যার ক্যাপসুলে ঢুলে পড়বে। ঢোকার আগে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলো তানজিল।

কে জানে,হয়তো এই ঘুম আর নাও ভাঙতে পারে!

ক্যাপসুলে ঢোকার পর শিষ দিয়ে সেটার কপাট বন্ধ হয়ে গেলাও। একধরনের ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তবে এটা বেশ আরামদায়ক। ঘুমানোর আগে শেষ বারের মত পৃথিবীর কথা মনে পড়লো তার। নিজের কল্পনার চোখে পৃথিবীকে দেখতে পেল সে। মনে মনে বললো, 'মানবজাতির হয়তো সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মিশন এটি।' মনে মনে আশা করলো এটি যেন বিফলে না যায়।

আস্তে আস্তে তার দু-চোখের পাতা এক হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর অতল ঘুমে তলিয়ে গেলো সে।

বাংলাদেশে এই প্রথম
ডিজিটাল ইন্টারেকটি PDF

১২ ধরনের চাকরি যেখানে প্রোগ্রামিং লাগে না

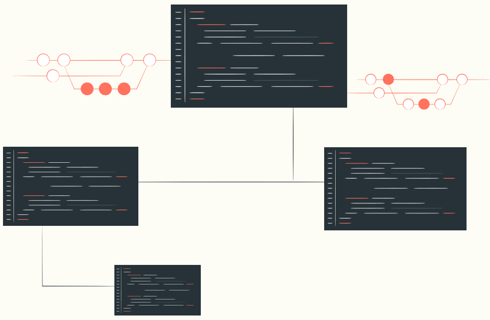

ঝংকার মাহবুব
লেখক,
ওয়েব ডেভেলপার,
পাইথন ট্রেইনার।

প্রোগ্রামিং রিলেটেড ১২ ধরনের চাকরি যেখানে প্রোগ্রামিং করা লাগে না। হালকা আইডিয়া থাকলেই চলে।

টেস্টিং বা কোয়ালিটি

এই ধরনের চাকরিকে অনেক সময় QA (Quality Assurance) বলা হয়। এদের কাজ হচ্ছে সফটওয়ার টেস্ট করা। ঠিকমতো কাজ করে কিনা যাচাই করা। বেশিরভাগ কোম্পানিতে ২ থেকে ৪জন প্রোগ্রামারের কোড টেস্ট করার জন্য একজন করে QA এর লোক থাকে। সফটওয়ার বানানোর পর সেগুলা কাস্টমারের কাছে রিলিজ করার আগে সেগুলা QA এর লোকেরা চেক করে দেখে সব ঠিক মতো কাজ করে কিনা।

যেমন ধরো একজন একটা সিম্পল ক্যালকুলেটর বানাইছে। সেখানে দুইটা সংখ্যা যোগ করার একটা সিস্টেম আছে। এখন টেস্টিং বা QA এর লোকের কাজ হবে। এই যোগ করার সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করতেছে কিনা যাচাই করে দেখা। সেজন্য সে হয়তো প্রথমে ২ আর ৩ যোগ করে দেখবে। এইটা ঠিকমতো কাজ করলে হয়তো শূন্য এবং অন্য একটা সংখ্যা দিয়ে চেষ্টা করবে। তারপর হয়তো দুইটা নেগেটিভ সংখ্যা। একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ। আবার অনেক বড় বড় দুইটা সংখ্যা বা দশমিক ওয়ালা সংখ্যা যোগ করে দেখবে ঠিক মতো কাজ করছে কিনা।

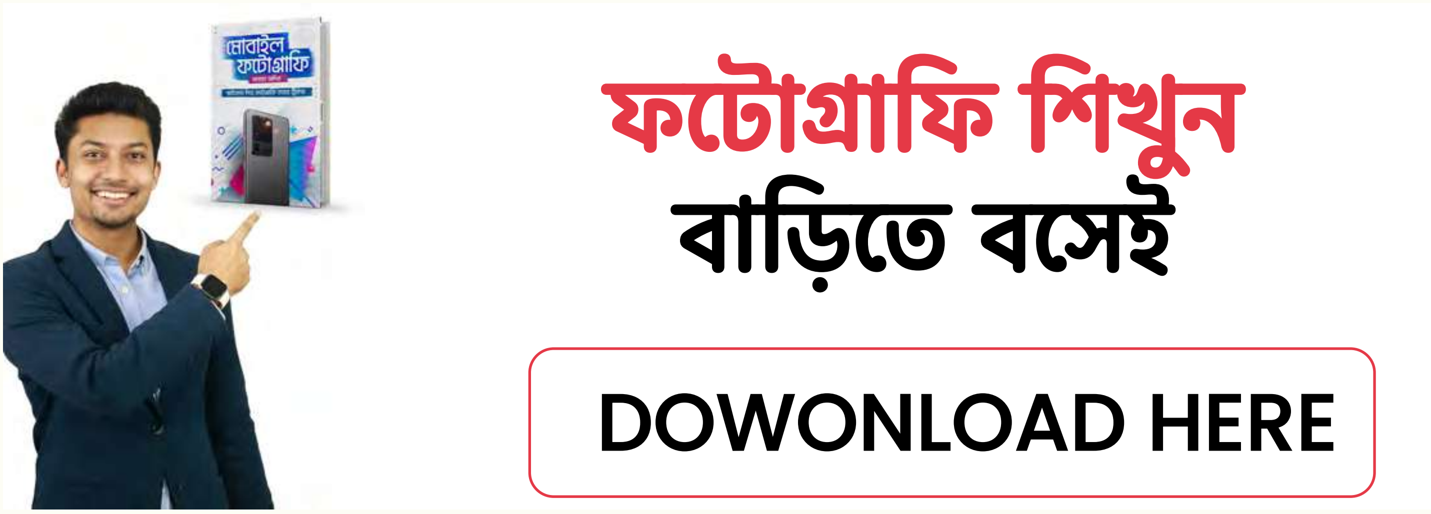

ফোটন

সফটওয়্যার সাপোর্ট বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট

বড় বড় সফটওয়ার ইউজ করার সময় কাস্টমাররা অনেক সময় আটকে যায়। তখন যারা সফটওয়ার বানাইছে তাদেরকে ফোন করে বা ইমেইল করে হেল্প চায়। তখন যারা হেল্প করে তাদেরকে সফটওয়ার সাপোর্ট বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট বলে। অনেকটা টেকনিক্যাল কল সেন্টারের মতো।এরা মাঝে মধ্যে গিয়ে ক্লায়েন্টের অফিসে গিয়ে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে আসে। যারা টেকনিক্যাল সাপোর্টে কাজ করে তাদের সফটওয়্যারের ব্যবহার এবং কিভাবে কাজ করে, ভিতরে ফাংশনালিটি, খুঁটিনাটি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। তবে প্রোগ্রামিং করতে হয় না।

বিজনেস এনালিস্ট

এদের কাজ হচ্ছে কাস্টমার কি চায় সেগুলা বের করা। তারপর ডেভেলপারদের বলা যে কি কি ফিচার যোগ করা লাগবে। এদেরকে প্রোগ্রামিং করতে হয় না। কিন্তু টেকনিক্যাল জিনিসগুলা বুঝতে হয় যাতে ক্লায়েন্টকে বলতে পারে কোনটা করা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব না। আবার কোন কাজটা করতে কত দিন লাগতে পারে।

গ্রাফিক ডিজাইনার

এদেরকে অনেকসময় ডিজাইনার বা ইউজার ইন্টারফেইস (UI) ডিজাইনার বলে। এদের কাজ হচ্ছে কোন জায়গায় কি থাকবে, সেগুলা দেখতে কি রকম হবে, কি কালার দিবে, কয়টা পেইজ হবে। লেখাগুলো বড় না ছোট হবে। কোন চার্ট থাকবে কিনা, ইত্যাদি। গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে ডিজাইন এর সেন্স থাকতে হবে। ফটোশপ ভালোভাবে জানতে হবে কিন্তু প্রোগ্রামিং লাগবে না।

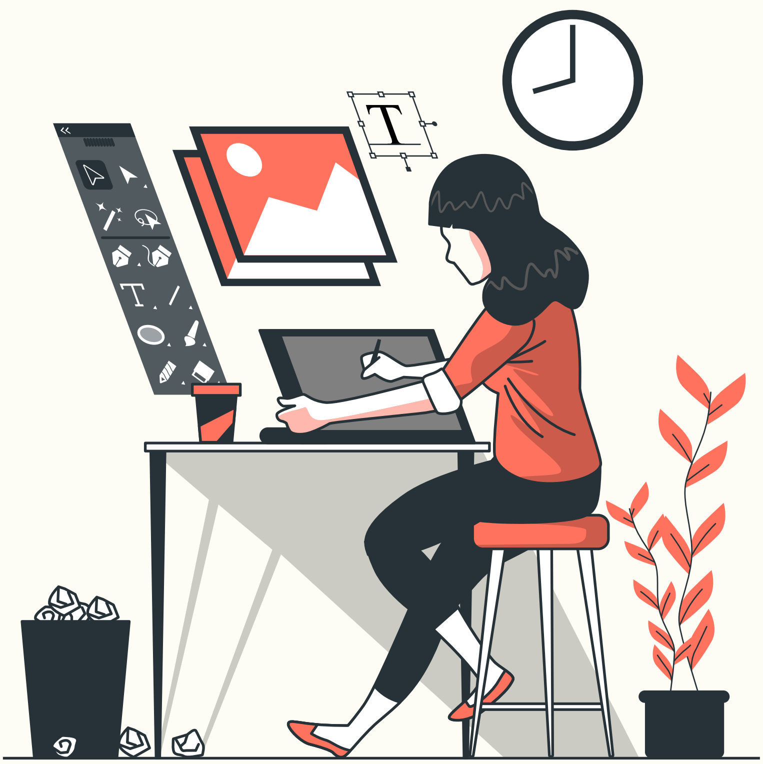

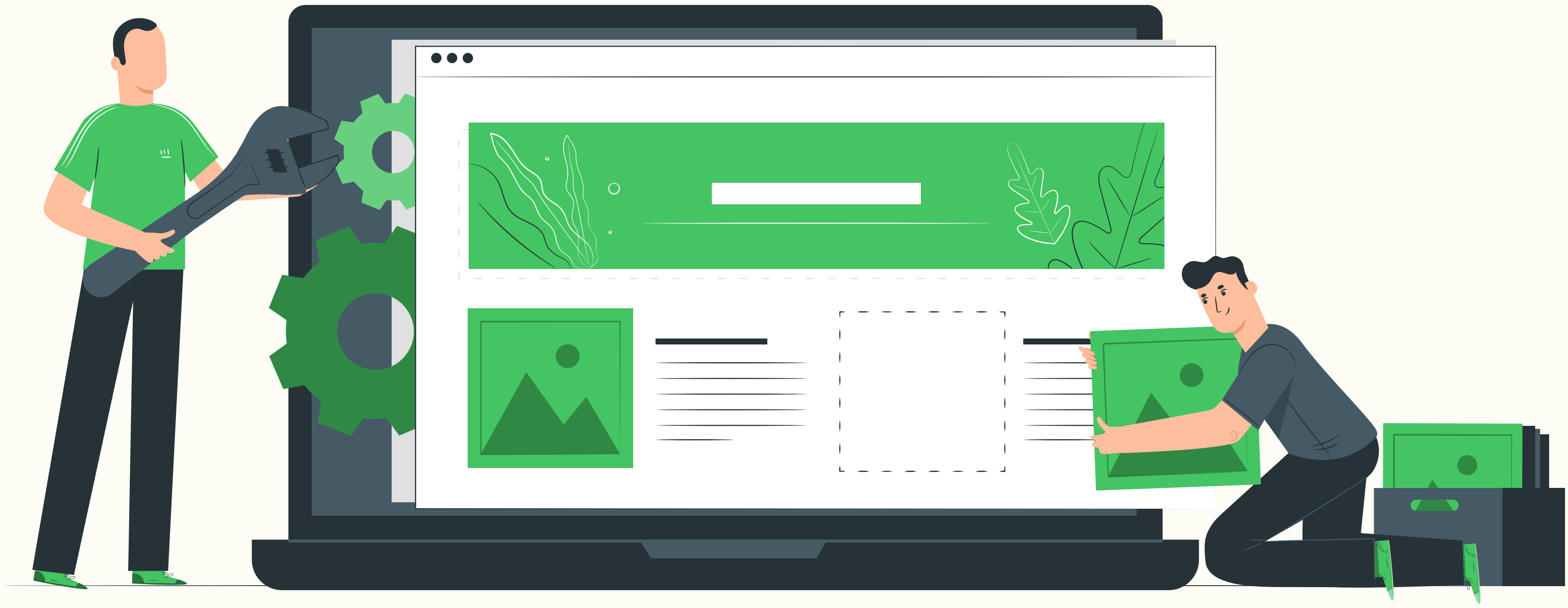

ইউজার এক্সপেরিয়েন্স(UX)

এদের কাজ হচ্ছে ডিজাইনটাকে যাচাই করা। সফটওয়ারটা ব্যবহার করতে লোকজনের সমস্যা হচ্ছে কিনা। বা কোন জিনিস মানুষ বেশি দেখতেছে আর কোন জিনিস কম দেখতেছে। কোন জায়গার বাটন বামে সরালে বা বড় করলে লোকজনের পড়তে সুবিধা হবে। কোন ফন্ট ইউজ করলে ভালো হবে। কোন চার্ট দেখে লোকজন বুঝতে পারতেছে না সেটা আইডেন্টিফাই করা। তারপর সলুশন দেয়া।

টেকনিক্যাল রাইটার

বড় বড় সফটওয়ারের ম্যানুয়াল লেখা লাগে। বেশিরভাগ ওয়েবসাইটে হেল্প পেইজ থাকে। যেখানে গেলে কিভাবে সফটওয়ার ব্যবহার করতে হয় সেগুলা লেখা থাকে। যারা এইগুলা লেখে তাদেরকে টেকনিক্যাল রাইটার বলে। এইসব টেকনিক্যাল রাইটারদের প্রোগ্রামিং করা লাগে না কিন্তু টেকনিক্যাল জিনিসগুলা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। আর কোন জিনিস বুঝতে না পারলে সেগুলা ডেভেলপারদের সাথে আলোচনা করে নেয়।

সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেশন বা IT

কোন অফিসের কম্পিউটারগুলো সেটআপ করা। নেটওয়ার্কিং করা। সফটওয়্যার ইনস্টল করা। কোন কিছু অটোমেশন করার দরকার হলে করা। কোন হার্ডওয়ার লাগলে কোনগুলা কিনবে, কতগুলা কিনবে, কেনো কিনবে সেগুলা ঠিক করা। এই টাইপের চাকরিতে টুকটাক প্রোগ্রামিং লাগে। তবে ফুলটাইম প্রোগ্রমিং লাগে না।

ফোটন

ডেভ অপস (Dev Ops)

এইটা অনেকটা সিস্টেম অ্যাডমিন এবং ডেভেলপারের মাঝামাঝি পজিশন। এদের কাজ হচ্ছে কোন একটা সফটওয়ার কিভাবে রিলিজ দিবে। কিভাবে সেটা ক্লায়েন্ট ব্যবহার করবে। কোন সিকিউরিটি ইস্যু আছে কিনা। সার্ভার কাজ না করলে কি করবে এই সব ঠিক করা। এই পজিশনে অনেক কিছু সেটআপ দিতে হয়। এবং সেটআপ দেয়ার সময় কিছু প্রোগ্রামিং করা লাগে। তবে একবার সেটআপ দেয়া হয়ে গেলে আর তেমন প্রোগ্রামিং লাগে না।

সফটওয়্যার সেলস

সফটওয়ার মার্কেটিং বা বিক্রি করার জন্য কিছু লোক দরকার হয়। এদের কিছু টেকনিক্যাল আইডিয়া থাকা লাগে। তাই তোমার সেলস এর বিষয়ে প্যাশন থাকলে। সফটওয়্যার সেলস এ যেতে পারো।

টেকনিক্যাল (recruiter)

এদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সফটওয়ার কোম্পানির জন্য ডেভেলপার হায়ার করে দেয়া বা খুঁজে বের করে দেয়া। এরা ডেভেলপারদের সাথে কথা বলে তাদের স্কিল লেভেল অনুমান করার চেষ্টা করবে। তারপর বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির ইন্টারভিউ এর জন্য রিকমেন্ড করবে। যদি তার রিকমেন্ড করা লোক ওই কোম্পানি হায়ার করে তাহলে সে একটা কমিশন পায়।

প্রোগ্রাম ম্যানেজার

এদের কাজ হচ্ছে সফটওয়্যারের কোন কোন ফিচার কবে ডেভেলপ করা হবে। কোন ডেভেলপার কোন ফিচারটা ডেভেলপ করার কাজ করবে। কতদিন লাগতে পারে। কবে সফটওয়্যার রিলিজ দিবে। সাপ্তাহিক প্ল্যানিং করা। প্রগ্রেস চেক করা, ইত্যাদি ঠিক করা ।

ওয়ার্ডপ্রেস

বিশ্বাস করো আর নাই করো। তুমি যদি ওয়ার্ডপ্রেসের থিম কাস্টমাইজ না করলে প্রোগ্রামিং ছাড়াই ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলা যায়। কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে।

তবে যেই চাকরিই করো না কোনো, বাপের হোটেল ছাড়া দুনিয়ার আর কোন আরামের চাকরি নাই। কষ্ট করতে হবে শিখার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে যে লাইনে যাবে সেখানেই শাইন করতে পারবে।

অনলাইন ক্লাস ও আমরা

মহসিন আহমেদ
স্কলার্সহোম,সিলেট

যুগ পাল্টেছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পৃথিবীটা এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ' হয়ে গেছে। যুগের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে আমাদেরও পরিবর্তন হচ্ছে। আগে স্কুল-কলেজে একটানা দীর্ঘ ৬ ঘন্টা ক্লাস করার পরও প্রাইভেট কোচিং এ পড়তে হলে একেক স্যারের কাছে একেক বিষয়ের জন্য দৌড়াতে হতো। দিনশেষে পাহাড়সম ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরে আর বই খুলতে ইচ্ছা করতো না। তাই এতো কোচিং করেও সন্তোষজনক ফলাফল পেতে বেগ পেতে হতো। এখন ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে ঘরে বসেই মোবাইল ব্যবহার করে সারাবিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে পছন্দ অনুযায়ী ক্লাস করা যায়। বিশেষ করে করোনা মহামারী প্রকট হওয়ার সূচনালগ্নে যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তখন অনলাইনে পড়াশোনার পরিমাণ শতগুণ বেড়েছে, শিক্ষার্থীরা খুশিমনে অনলাইনে পড়তে আরম্ভ করেছে এবং উপভোগও করছে। কারণ, এতে যাতায়াত খরচ-সময় সবকিছু বেঁচে যায়। ফলে আগে পড়াশোনার পিছনে যে অতিরিক্ত সময় যেগুলো রাস্তার যানজটে নষ্ট হতো – সেগুলো বেঁচে যাচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা লাভবান হচ্ছে।

অনলাইন লাইভ ক্লাসের উপকারিতা সম্বন্ধে লিখতে গেলে অনেক কিছু লিখা যাবে। সরাসরি সমস্যা সমাধান–প্রশ্নোত্তর সবকিছুই লাইভ ক্লাসে এখন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই বিষয়টি উপভোগ করে থাকেন। তাছাড়া প্রিরেকর্ডেড ক্লাস ও করা যায়,যেগুলা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে তৈরী করা হয় এবং শিক্ষার্থীর মনে সম্ভাব্য যা যা প্রশ্ন আসতে পারে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর অনলাইনে শিক্ষকদের পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিনামূল্যে বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিয়ে লাইভ ক্লাস করা যাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা 'ZOOM' অ্যাপের মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছেন। ফেসবুকে এডুকেশনাল গ্রুপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাই-আপুরা নিয়মিত লাইভ ক্লাস নিচ্ছেন - যেখানে শিক্ষার্থীদের মন্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

সম্প্রতি একটা ভিডিওতে দেখা গেছে, এক শিক্ষার্থী ক্লাস করার সময় তার বাবার বয়সী শিক্ষকের সাথে বেয়াদবীমূলক অসভ্য আচরণ করছে। অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ সহ দীর্ঘ সময় ধরে টিজ করছিলো ।

Robi 10 Minute School সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় প্রতিদিন ই লাইভ ক্লাস

আয়োজন করে থাকে, যেখানে অনেক মহিলা ইন্সট্রাক্টর থাকেন। যেহেতু লাইভ ক্লাস সবার মন্তব্যের সুযোগ থাকে, সেই সুবাধে দেখা যায় অনেক মুখোশধারী শিক্ষার্থী গ্যাং তৈরি করে ওই ইন্সট্রাক্টরকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল বাক্যালাপ, অসভ্য আচরণ তথা টিজ করা শুরু করে। এগুলো যখন তারা পড়েন – তাদের নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পরে। অনেকে সামলে নেন। অনেকে ডিপ্রেসড হয়ে যান। অনেকে পাত্তা দেন না।

একজন শিক্ষক যখন দেখেন তার ছেলেবয়সী শিক্ষার্থী অসভ্য আচরণ করছে, তখন তিনি মানসিকভাবে আঘাত ও মনোকষ্ট পান। এরজন্য শিক্ষার্থীর জীবনে অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে,যা সে ভাবতেও পারবেনা। আর অনেক শিক্ষার্থী মহিলা ইন্সট্রাক্টর দেখলেই এলাকার টঙের দোকানের বখাটেদের মতো অনলাইনে বখাটে সুলভ আচরণ করে। এসময় তার এটা মাথায় থাকে না যে ঘরে তারও বোন আছে, মা আছে। তাদেরও বাজারে যেতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়, ক্লাসে পড়াতে হয়।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের মূল পরিচয় আমরা শিক্ষার্থী। যেহেতু লাইভ ক্লাসে ডাটা খরচ করে ঢুকি, তার মানে শিক্ষার্থী হয়েই কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্যই ঢুকেছি। যদি জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা না হয় , তাহলে ঢোকারও প্রয়োজন নেই। কি দরকার, বাবার কষ্টের টাকা খরচ করে আরেকজনের সাথে অসভ্য আচরণ করার? তাও আবার একজন শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার করার! শিক্ষকতা হলো সর্বোত্তম একটি পেশা। এটাকে পেশা বলতে আমি নারাজ। শিক্ষকতা কোনো পেশা নয়। এটা একটা মাধ্যম। জ্ঞান আদান-প্রদানের মাধ্যম। এই মাধ্যমের সাথে কোনো প্রকার অসংলগ্ন আচরণ করা আমাদের জন্য উচিৎ নয়। আর বাবার কষ্টের টাকা যদি জলে ফেলি, তাহলে তার জন্য আমার নিজেকেই ভুগতে হবে । হতে পারে ভবিষ্যতে নিজেকে এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। তা পরিবারেই হোক, বন্ধুমহলেই হোক আর কর্মক্ষেত্রেই হোক । শিকার হতে হবেই।

আসুন, নিজেকে বদলাই।

ডিজিটাল ইন্টারএকটিভ সূচিপত্র

মান উন্নত ভিডিও এর ঝামেলা আর নয়

Download for Free

ডিসেম্বরের শহরে

আশরাফী জাহান জান্নাতী
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
সাভার, গাজীপুর।

ফাল্গুন ফুরিয়েছে। চৈত্রের আনাগোনা প্রকৃতি জুড়ে। বিবর্ণ , জীর্ণ-শীর্ণ বৃক্ষ চিরহরিৎ রূপ নিয়েছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নতুন পাতার সাথে নতুন ফুল কুঁড়ি নিয়ে ।যেন অতীতের সব দুঃখকে বিসর্জন দিয়েছে তারা ! নতুন করে বাঁচার আশা জাগে ; নতুন উদ্যোমে।

আমাদের জীবনেও ফাল্গুন ফুরিয়ে চৈত্র এসেছিল। অতীতের দুঃখ-বেদনাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জেগেছিল মনে। সব অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম । প্রতিবাদের সর্বশেষ পন্থা ছিল একমাত্র যুদ্ধ । মুক্তিযুদ্ধ ।

চৈত্র যে অতীত ভুলিয়ে শুধুমাত্র নতুন স্বপ্ন সঞ্চার করে, সেটা ভুল। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে প্রকৃতির যে হাহাকার তার কি হবে? নতুন স্বপ্নের সাথে আমাদের জীবনও যে বিষাদময় হয়ে ওঠে। তবে দিনশেষে এই বিষাদের স্বাদ সুখেরই ছিল !

'৭১-র ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় আমাদের সর্বশেষ প্রতিবাদ; মুক্তিযুদ্ধ। একটুও ভয় পায় নি আমরা। তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলাম আমি আর শ্যামল। যুদ্ধের সময় ফিরে আসি গ্রামে। অধ্যাপক হিসেবে গ্রামে আলাদা একটা সম্মান ছিল শ্যামলের। হয়তো সেই কারনেই ও পেরেছিল সবাইকে একত্র করতে। ৩০-৪০ জনের একটা দল করেছিল; যার অধিনায়ক শ্যামল নিজেই। সেই সাথে গঠন হলো ঘর শত্রু বিভীষণের মতো রাজাকার বাহিনী। খুব বেশিদিন গ্রামে থাকতে পারে নি। কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছিল তা আমার জানা নেই। তবে নভেম্বরের শেষে শ্যামল দল নিয়ে ফিরেছিল। দলে তখন ৫০-৬০ জনের মতো। হয়তো তারা অন্য গ্রাম বা শহর থেকে এসেছিল। নিজ জেলা শহর যশোরকে স্বাধীন করেছিল তারা। সেদিন সে বিজয়ের আনন্দ নিয়ে যুদ্ধের পর প্রথম ঘরে ঢুকেছিল। ভেবেছিলাম হয়তো সে আর যুদ্ধে যাবে না ।

১৪,ডিসেম্বর। সে আবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

- অনেক তো হলো যুদ্ধ। এবার না হয় ইতি টানলে!
সেদিন সে খানিকক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দিয়েছিল,
- অনিতা, তুমি হয়তো নিজেও জানো না তুমি এখন বড্ড স্বার্থপরের পরিচয় দিচ্ছো!
- একেবারে নিঃস্বার্থবান কেউ হয় বলে আমার জানা নেই।
- অবুঝের মতো কথা বলা তোমাকে সাজে না।
- একটু বেমানান হোক না!
- দেশ স্বাধীনের অনুপ্রেরণা তুমিই দিয়েছিলে। আজও দেবে।
- এই যে বললে স্বার্থপর আমি। তাহলে?
- বিশ্বাস এটা।
- আবার ফিরে আসবে?
- কথা দিলাম।
- যদি না আসো?
- যত অভিযোগ ,শাস্তি ওপারেই দিও।
- আর কি ডিসেম্বর আসবে?
- হয়তো আসবে।
- অপেক্ষায় থাকলাম তোমার ফিরে আসার।
- তাহলে আজ আসি?
- কিছু দিবে না?
- যেমন?
- স্মৃতি ।
- তোমাকে দেওয়ার মতো এখন কিছু নেই যে আমার!
- যা আছে সেটাই না হয় দাও!
- তোমাকে দেওয়ার মতো নয়টা অক্ষর আছে আমার। তার থেকে চারটা তুমি নাও ।
- তাই নিলাম। আরও পাঁচটা দাও।
- বাকি পাঁচটিও দিলাম। এখন শব্দ বানিয়ে দাও।
- স্বাধীনতা। ভালোবাসা।
- আজীবন যত্ন করে রাখবো।
- তবে তাই রেখো।

যুদ্ধ চললো ন'মাস ।

এর মধ্যে কতক প্রাণ গেলো বন্দুকের নলের সামনে মাথা ঠেকিয়ে। আবার কতক গেলো আমাদের নদী মাতার বুকে ডুবে। কতক গেলো দহনে দহিত হয়ে! আরও কত প্রান ঝরে গেলো গোলাবারুদে!

আর যাদের সম্ভ্রম গেল তারা না হয় আড়ালেই থাকুক! আবার হয়তো বঙ্গবন্ধুর মতো কোনো উদীয়মান তরুণ এসে তাদের সম্মান ফিরিয়ে দেবে।

১৬ ই ডিসেম্বর। দেশ স্বাধীন হলো। আমাদের বুকে চৈত্র মাসে যে দাবানলের সৃষ্টি হয়েছিল, ডিসেম্বরের শীতল হাওয়া তা নিভিয়ে দিয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বরের একটি শীতল সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত উপহার পায় সদ্য আবির্ভূত "বাংলাদেশ "।

'৭১ র ডিসেম্বরের পর এক, দুই, তিন করে আরও ৪৮ টি ডিসেম্বর পার হয়ে গেছে। ক্রমাগত চলতেই থাকবে। অথচ শ্যামল আসে নি। হয়তো শ্যামল আর আমার জীবনে কখনো সেই ডিসেম্বর আসবেই না! জীবনে কিছু অপূর্ণতা থাকবেই। অপূর্নতাই যেন জীবন নামক রচনার উপসংহার! তবে যতদিন বেঁচে রইবো, ততদিন খুব যতনে শ্যামলের দেওয়া নয়টি অক্ষরের দুইটি শব্দ আগলে রাখবো।
"স্বাধীনতা।" “ভালোবাসা ।"

শব্দ দুটির গঠন কত সহজ, সাবলীল। অথচ মাহাত্ম্য! এদের গভীরতা সমুদ্র সমান।

"ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি শ্যামলের এই স্বাধীনতাকে।"

আজ এক বৃদ্ধার শবদাহ করতে এসে ইন্সপেক্টর পল্লব দাস বৃদ্ধার মরীচা পড়া টিনের পেটরা থেকে একটা ডাইরি পান। সেখান থেকেই এতোক্ষন লেখাগুলো পড়ছিলেন।

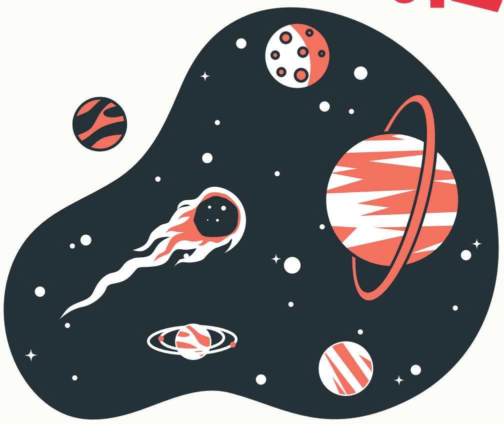

মহাবিশ্বের এক অত্যাশ্চর্যঃ নীহারিকাপুঞ্জ

ইসনাত মেহরীন সামি
চট্টগ্রাম গভ. উইমেন'স কলেজ, চট্টগ্রাম।

আমাদের সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেখা-অদেখা প্রতিটি বস্তুই বিস্ময়কর। গ্রহ-নক্ষত্র, উল্কাপিন্ড, ধুমকেতু, ছায়াপথ, কৃষ্ণগহ্বর এবং আরো হাজারো মহাজাগতিক বস্তু নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, এমনকি সাধারণ মানুষের আগ্রহের শেষ নেই!তাইতো সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মানুষ সীমাহীন আকাশের রহস্য উদঘাটনে তৎপর।

মহাকাশের একটি বিস্ময়কর বস্তুর উদাহরণ দিতে গিয়ে যদি নীহারিকাপুঞ্জের কথা বলা হয় তাহলে মোটেও ভুল বলা হবে না।একেকটি নীহারিকার অভ্যন্তরে কয়েকশত সৌরজগত অনায়াসে অবস্থান করতে পারবে।কাজেই বোঝা যাচ্ছে এরা কতটা বিশাল।কিন্তু নীহারিকা আসলে কী?বিজ্ঞানীদের গবেষণামতে,নীহারিকা হলো সাধারণত হাইড্রোজেন ও প্লাজমা দ্বারা গঠিত একপ্রকার মহাজাগতিক মেঘ ।এই মেঘের সাথে নক্ষত্রের জন্মমৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।মোটামুটিভাবে বলা যায়,নক্ষত্রের জীবনচক্রে নীহারিকাপুঞ্জের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিদ্যমান।

এবার আসা যাক নীহারিকার বিস্তারিত পরিচয়ে।নক্ষত্রের জন্ম হয় নীহারিকা থেকে কিন্তু নীহারিকার জন্ম কোথা থেকে হয়?উত্তরটা সহজঃ নক্ষত্র থেকে। নক্ষত্রভেদে নীহারিকার জন্ম বিভিন্নভাবে হতে পারে।মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীদের যেমন মৃত্যু আছে, তেমনি বিশাল তারকাগুলোরও একসময় আয়ু ফুরিয়ে আসে।কিছু নক্ষত্র তাদের মৃত্যুকালে বিস্ফোরিত হয়ে তার সমস্ত পদার্থ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়,যাকে বলা হয় ‘সুপারনোভা’। এই সুপারনোভার ফলে নক্ষত্রের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া পদার্থ নিয়ে গঠিত হয় নীহারিকা।আবার,অনেক নক্ষত্র মৃত্যুর সময় তার বাইরের সমস্ত বস্তু বের করে দেয়।অনেকটা খোলস ছেড়ে দেওয়ার মতোই বলা যায়।তখন মূল নক্ষত্রটি খুব ছোট ও সাদা গোলকের মতো দেখতে লাগে,যাকে ‘শ্বেত বামন’ বলা হয়।শ্বেত বামনের বের করে দেওয়া গ্যাস ও প্লাজমা তখন আয়নিত হয় এবং তা থেকে ফোটন নির্গত হয়,ফলে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়।এভাবে সৃষ্ট নীহারিকাকে ‘গ্রহ নীহারিকা’ বলা হয়। এভাবে নীহারিকার শ্রেণীবিভাগ করা যায় তাদের জন্মের ধরনের উপর ভিত্তি করে। আরো একভাবে নীহারিকাপুঞ্জের শ্রেণীবিভাগ করা যায়,সেটি হলো আলোর

ধরনের উপর ভিত্তি করে।এভাবে ধরলে দেখা যায় নীহারিকা ২ ধরনের,যথা-উজ্জ্বল নীহারিকা ও অনুজ্জ্বল নীহারিকা।সাধারণত উজ্জ্বল নীহারিকা হলো তার আশেপাশের এলাকার তুলনায় উজ্জ্বল,আর অনুজ্জ্বল নীহারিকা তার আশেপাশের তুলনায় কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ।উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল নীহারিকার উদাহরণ দেওয়া যাক।মিজার-৪২(যা সাধারণভাবে কালপুরুষ নীহারিকা নামে পরিচিত)একটি উজ্জ্বল নীহারিকা,যার অবস্থান ছায়াপথের দক্ষিণভাগে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে।এটি রাতের আকাশে খালিচোখেও দেখা যায়।সর্বপ্রথম ১৬১০ সালে নিকোলাস ক্লড নামক এক ফরাসি ব্যাক্তি এটি আবিষ্কার করেন। পৃথিবী থেকে এটি প্রায় ২৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।আর কাঁকড়া নীহারিকা বা ক্র্যাব নেবুলার নাম আমরা সবাই কমবেশি জানি।এটি আবিষ্কৃত হয় ১৭৩১ সালে জন ডেভিস কর্তৃক।

এ তো গেলো উজ্জ্বল নীহারিকার কথাবার্তা ।এবার আসি অনুজ্জ্বল নীহারিকার উদাহরণে। হর্স হেড নীহারিকা এর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে।খালি চোখে এটিকে শনাক্ত করা যায় না।এটি আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৮ সালে। আরো কিছু বিখ্যাত নীহারিকার কথা না বললেই নয়।ঈগল নীহারিকা, যাকে অন্যভাবে বলা হয় ‘পিলারস অফ ক্রিয়েশন’ ,এর ছবি আমরা কোথাও না কোথাও দেখেই থাকবো-তিনটি খাড়া স্তম্ভ যেন দাঁড়িয়ে আছে!তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো,এটি সম্ভবত আর নেই। বিজ্ঞানীরা বলেছেন কোনো সুপারনোভার কারণে এই নীহারিকাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ।তবুও আরো কয়েক হাজার বছর ধরে আমরা এটিকে দেখতে পাবো,কারণ সেখান থেকে আলো ভ্রমণ করে পৃথিবীতে আসতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে। আরেকটি নীহারিকার কথা বলা যায়,সেটি হলো বাটারফ্লাই বা প্রজাপতি নীহারিকা। দেখতে অনেকটা ডানা ছড়ানো প্রজাপতির মতো বলে এর নাম প্রজাপতি নীহারিকা।তারপর আছে ক্যাটস আই নীহারিকা,থর’স হেলমেট নীহারিকা,ক্যালিফোর্নিয়া নীহারিকা ইত্যাদি ।এরকম আরো অনেক নীহারিকা আছে যাদের নামকরণ করা হয়েছে তাদেরকে দেখতে ঠিক কীরকম লাগে তার উপর ভিত্তি করে।

নীহারিকাপুঞ্জ নিয়ে আরো কিছু কথা বলা

Click Here

দরকার। এরা আকারে অনেক বড় হলেও এদের ঘনত্ব কিন্তু একদম কম।কতটুকু কম সেটার একটা ধারণা দেওয়া যাক।একটি নীহারিকার পৃথিবীর সমান জায়গার ভর সর্বোচ্চ কয়েক কিলোগ্রাম!আর এরা যদি কম করে হলে কয়েক আলোকবর্ষ পরিমাণ জায়গা দখল করে তাহলেই বোঝাই যাচ্ছে এদের ঘনত্ব কতটা কম। নীহারিকাপুঞ্জ নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বিজ্ঞানীদের তুলনায় কিছু অংশেই কম নয়!বিভিন্ন কার্টুন,সিনেমায়,সায়েন্স ফিকশন বইয়ে নীহারিকার যথেষ্ট কদর করা হয়েছে। অনেক মানুষই মহাকাশযান করে নীহারিকা ভ্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেন।যদিও আমরা জানি যে,এটা বর্তমানে সম্ভব নয় কেননা যেখান থেকে আলো আসতেই শত শত বছর সময় লাগে সেখানে মানুষের যেতেই হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যেতে পারে।তবুও আমরা আশা করতে পারি,অদূর ভবিষ্যতের কোনো এক সময় উচ্চগতিসম্পন্ন মহাকাশযান আবিষ্কৃত হবে যাতে করে মানুষ দূরদূরান্তের নীহারিকাপুঞ্জ ভ্রমণ করতে পারবে।ততদিনে রাতের আকাশে টেলিস্কোপ দিয়ে উপভোগ করতে থাকি মহাবিশ্বের অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য-নীহারিকাপুঞ্জ।

ফোটন

জগাখিচুড়ি ও সংকরায়ন

সাদমান সাদিক

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Bsc Engg(LE) 1st year

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি, রাকিব তপু ও সজীব ঘরের মধ্যে বসে গল্পের বই পড়ছি। একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ বিরাজ করছে। রাকিব বললো, এই বৃষ্টিতে খিচুড়ি রান্না করলে মন্দ হয় না। আমরা সবাই প্রস্তাবটি শুনে খুব খুশি হলাম।

রাকিব বললো , তাহলে চলো আমরা সবাই মিলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী গুলো কিনে আনি। এরপর আবার সবাই বাজারে চলে গেলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য।

তবে আমরা জিনিস কেনার সময় একটি ভুল করে ফেললাম। আমরা চারজনের সবাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাল কিনে ফেলেছিলাম। রাকিব কিনেছে চিকন চাল, তপু কিনেছে বাসমতি চাল, সজীব কিনেছে মোটা চাল।

এবার তাহলে কি হবে? সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

তপু বলল, ব্রো প্যারা নাই চিল। আমরা সব চাল গুলো একত্র করে খিচুড়ি রান্না করি। আমরা তখন সব চালগুলো একত্র করে খিচুড়ি রান্না করলাম। সেই খিচুড়ি সবাই ভাগ করে খেলাম। যেহেতু চার প্রকারের চাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হয়েছে তাই আমরা সেই খিচুড়িটার নাম দিলাম জগাখিচুড়ি।

আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাল কিনলেও, খিচুড়ি খাবার সময় কিন্তু আমরা প্রত্যেকে চার প্রকার এর চাল খেয়েছি।

তেমনি রসায়নে, কোন মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ও আকারের অরবিটাল কে সমশক্তি সম্পন্ন ও সম আকারে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সংকরায়ন বলে।

অর্থাৎ আমরা যখন চারটি ভিন্ন প্রকারের চাল কিনেছিলাম, তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ছিল। কিন্তু আমরা যখন চার প্রকারের চাল একত্র করে খিচুড়ি রান্না করলাম তখন সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চালগুলো একই অবস্থায় ছিল। সেটার নাম আমরা দিয়েছি জগা খিচুড়ি।

তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও আকারের অরবিটাল s , p , d , f কে সমশক্তি ও সম আকারের একটি অরবিটাল শাঁই দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই শাঁই হলো নতুন অরবিটাল যেটাকে তুমি জগা খিচুড়ির সাথে তুলনা করতে পারো।

বাজারে অনেক প্রকারের চাল পাওয়া যায় । এদের মধ্যে বাসমতি চাল , সরু চাল

এগুলো বেশি প্রচলিত। তেমনি ভাবে সংকরায়ন অনেক প্রকারের হয়। যেমন: SP^3, SP^2 , SP, SP^3D^2 । নির্দিষ্টভাবে সংকরায়ন কত প্রকার তা বলা সম্ভব নয়।

আচ্ছা ,এখন আমরা ধরে নেই-
বাসমতি চাল হলো S orbital.
সরু চাল হলো P orbital.

[এটা ধরে নিলাম কারণ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা যেকোনো কিছু ধরে নেওয়ার অধিকার রাখে ।]

এবার আমাদের মধ্যে যদি তিনজন সরু চাল আনতো ও একজন বাসমতি চাল আনতো, তাহলে সেই জগাখিচুড়ি টি হয়ে যেত SP^3 সংকরিত অরবিটাল।

যদি একজন বাসমতি চাল ও আরেকজন সরু চাল আনতো, তাহলে সেটি হয়ে যেত SP সংকরিত অরবিটাল।

আশা করি সংকরায়নের বিষয়টি তোমরা গল্পের মাধ্যমে একটু হলেও ধারণা পেয়েছো।

ফোটন

আরডুইনোর সাথে পরিচিতি

তানভীর শেখ
সিইও, আরডুইনো স্কুল।

তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে সায়েন্স ফেয়ার ভিজিট করেছো। আবার অনেকেই সায়েন্স ফেয়ারেও অংশগ্রহণ করেছো। সায়েন্স ফেয়ারগুলোতে দারুণ দারুণ প্রজেক্ট দেখে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে, এমন প্রজেক্ট যদি তুমিও বানাতে পারতে, তবে ব্যাপারটা বেশি দারুণ হতো।
তুমি কি জানো, সায়েন্স ফেয়ারের প্রায় ৮০% প্রজেক্টই একটি ম্যাজিক বক্সের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। জানতে চাও, কি সেই ম্যাজিক বক্স ?

এই ম্যাজিক বক্সের নামই আরডুইনো।
আরডুইনো বেশ কটমটে একটা শব্দ, তাই না? আমিই প্রথম যখন আরডুইনো নামটি উচ্চারণ করেছিলাম, তখন তো আমার দাঁত প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার মতো অবস্থা! তবে, আরডুইনো শব্দটা কঠিন হলেও এটি নিয়ে কাজ করা কিন্তু বেশ সহজ। তাহলে চলো, শুরু করা যাক!

আরডুইনো নামের এই ম্যাজিক বক্সের ইতিহাস সম্পর্কে জেনে নেই চলো!

আরডুইনোর ইতিহাসঃ

আরডুইনো এর জন্মস্থান হলো ইতালিতে। ২০০৩ সালে কিছু ইতালিয়ান ইঞ্জিনিয়ার চিন্তা করলেন যে, কেমন হতো, যদি যেকোন বয়সের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা কম্পিউটারের মতো যন্ত্র ব্যবহার করে সমাধান করতে পারতো। আর, সেই চিন্তা থেকেই ২০০৫ সালের দিকে 'মাসিমোবানজি' ও তার সহকর্মীরা মিলে এমন একটি ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম তৈরি করলেন, যেখানে যেকোন পেশার মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছাড়াই হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে পারে। আর, সেটিই হচ্ছে আরডুইনো।

তার মানে, মোট কথা হলো, আরডুইনো হলো ইতালিয়ানদের বানানো একটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। এখন কথা হলো, ডেভেলপমেন্ট কি ? সহজ কথায় বলতে গেলে, ডেভেলপমেন্ট হলো কোন কিছু বানানো। মনে করো, তুমি একটি প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে চাচ্ছো, আর সেই কারণেই তোমার দরকার হবে একটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। একটা প্রজেক্টের প্রাণই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। তুমি কি প্রজেক্ট বানাতে চাচ্ছো, সেটার উপর নির্ভর করে বাজারে বিভিন্ন রকম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড পেয়ে যাবে। কয়েকটা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের নাম হলো Raspberry Pi, Banana pi, Uddo Neo, Adafruit Flora আরও কতো!
যেমন, Raspberry Pi হচ্ছে একটি সিঙ্গেল বোর্ড কম্পিউটার। আরডুইনো শেখার পরে তোমরা Raspberry Pi শিখবে।
তোমাদের এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে, সেটা হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ছাড়া কি প্রজেক্ট করা সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু সেটা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ ।
আরডুইনো একটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, যেটা আমরা শুরুতে আলোচনা করেছি । এখন

ফোটন

বলবো আরডুইনোর প্রাণ, মাইক্রোকন্ট্রোলার কে নিয়ে ।
মাইক্রোকন্ট্রোলার হলো কম্পিউটারের ছোট ভাই।
বলতে পারো যে, কেন আমি মাইক্রোকন্ট্রোলারকে কম্পিউটারের ছোট ভাই বললাম। কারণ, কম্পিউটারে রয়েছে অনেক বড় সিস্টেমিক ইউনিট, যার মধ্যে প্রসেসর, র‍্যাম, মাদারবোর্ড থাকে । ঠিক তেমনি, কম্পিউটারের মতোই বিজ্ঞানীরা i¨vg, রম, প্রসেসর – সব মিলে মাইক্রোকন্ট্রোলার বানালেন , কারণ আমরা ছোট ছোট প্রজেক্ট এর জন্যে এতো বড় কম্পিউটার সেট আপ কে আনা লাভজনক হবে না । কারণ, একটি কম্পিউটারের দাম ২০ হাজার থেকে শুরু হয়ে থাকে। যেখানে একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার ৮০ – ১০০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যায়।
প্রশ্ন করতে পারো, “মাইক্রোকন্ট্রোলার দিয়েই যদি সব করা যায়, তাহলে আরডুইনো কেন?” কারণ, মাইক্রোকন্ট্রোলার দিয়ে প্রজেক্ট বানাতে অনেক ঝামেলা, অনেককিছুর সেট আপ করতে হয়, যা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ । তাই, প্রজেক্ট বানাতে আরও সহজ করতেই আরডুইনো। যাতে করে আমরা খুব সহজেই প্রজেক্ট বানাতে পারি অথবা রোবোটিক্স শিখতে পারি ।

বায়োলজি ড্রয়িং এর ভয় আর নয়।
Apar's Classroom
নিয়ে এসেছে বিনামুল্যের সমাধান
STORY MODE
LEARNING APP
Facebook Group
Click Here
Web App
Click Here

বাজারে আরডুইনো পরিবারঃ

আরডুইনোর পরিবার বিশাল বড় । বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন আরডুইনো ব্যবহার করা হয় । তবে, আরডুইনো পরিবারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ৩ টি সদস্য হলো ‘আরডুইনো মেগা’, ‘আরডুইনো উনো’, এবং ‘আরডুইনো ন্যানো’ । পরিবারের বড় ছেলে হলো আরডুইনো মেগা, মেজ ছেলে উনো এবং ছোটজন আরডুইনো ন্যানো। তুমি যদি আরডুইনো নিয়ে কাজ শুরু করতে চাও, তবে মেজ ছেলে ‘উনো’ কে দিয়ে শুরু করাটা

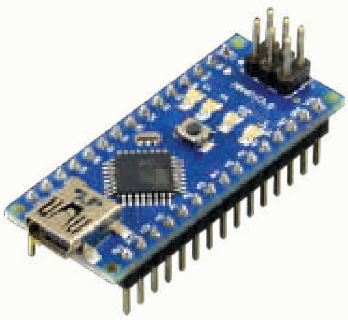

Arduino Nano

Arduino Uno

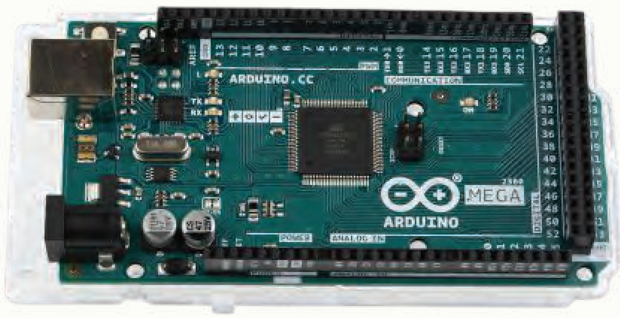

Arduino Mega

ভালো হবে ।

তাহলে আমরা এখন আরডুইনো উনোর কিছু ফিচার ও সুবিধা সম্পর্কে জানবো।

আরডুইনো এর ফিচারসমূহঃ

প্রতিটি আরডুইনোতে একটি করে মাইক্রোকন্ট্রোলার থাকে । যেমন, আরডুইনো উনোতে এটি মেগা 328 মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করা হয় ।

Operating Voltage : 5 V
মানে, আরডুইনো 5 ভোল্টেজ পেলেই সে নিজের কাজ করা শুরু করে দেয় । অর্থাৎ, আরডুইনো সচল হবে 5 ভোল্টেজে ।

Input Voltage : 7 -12 V

আরডুইনো 5 ভোল্টেজ এ পরিচালিত হলেও একে 7 – 12 ভোল্ট ইনপুট দিতে হয় । যেটা ডিসি জ্যাক এর মাধ্যমে দেয়া হয় । এইগুলো নিয়ে পরের পর্বে আলোচনা করা হবে ।

Digital I/O Pins : 14

আরডুইনোতে ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন রয়েছে 14 টি । যে পিনগুল্লো থেকে আমরা আউটপুট নিয়ে বিভিন্ন বাতি, মোটর ডিসপ্লে, রান করাতে পারি, আবার বিভিন্ন সেন্সর থেকে ইনপট ও নিতে পারি । এই 14 টি পিনের মধ্যে কোন পিনের কি কাজ, সেটা পরের পর্বে জানাবো ।

Analog Pins : 6

আমাদের যদি এনালগ ইনপুট আউটপুট এর দরকার হয়, তবে এনালগ পিনের মাধ্যমে আমরা এনালগ ইনপুট – আউটপুট নিতে পারবো ।
এছাড়াও রয়েছে,

Flash Memory: 32 kb
SRAM: 2 kb
EEPRAM: 1 kb
Clock Speed: 16 MHz

আরডুইনো এর সুবিধাসমূহঃ

1. Opensource:
অর্থাৎ, আপনি যেকোন প্রোগ্রাম গুগল থেকে নিয়ে বা, অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করে নিজের মতো এডিট করে চালাতে পারবে। আর, খুব সহজেই আপনার প্রয়োজনীয় সব তথ্যই পেয়ে যাবেন এবং এইক্ষেত্রে কপিরাইট আইন নেই ।

2. Portable:
যেকোন কাজে আরডুইনো খুব সহজে ইউজ এবং বহন করা যায় । যেকোন প্রজেক্ট খুব সহজে সেট আপ করা যায় ।

3. Simple & Clear Environment:
আরডুইনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই সোজা । এর প্রোগ্রামিং এর জন্যে সবচেয়ে সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাবহার করা হয় । আপনি খুব সহজেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারবেন । কিছুটা c এবং c++ এর সংমিশ্রণ ।

4. USB Interphase:
আরডুইনো তে প্রোগ্রাম আপলোড করার জন্য আলাদা কোন কিছু প্রয়োজন হয় না, খুব সহজেই USB ইন্টারফেজের মাধ্যমে প্রোগ্রাম আপলোড করা যায় ।

6. Friendly Communication Supported:
যেকোন কমিউনিকেশনের আরডুইনো খুব সহজে সাপোর্ট করে ।
এতসব সুবিধার জন্য ক্লাস সিক্স এর বাচ্চা থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্টরা - খুব সহজে আরডুইনো নিয়ে কাজ করতে পারে ।

আরডুইনো রোবোটিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স জগতকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তুমি খুব সহজেই আরডুইনো শিখে ফেলতে পারো ।। মজার ছলে তুমি আরডুইনো কোডিং ও করে ফেলতে পারো । চাইলে তোমার ফোনের মাধ্যমে বাসাবাড়ির লাইট, ফ্যান কন্ট্রোল করতে পারো । রোবট নিজে থেকে রাস্তা খুঁজে নিয়ে নিতে পারবে, সেইরকম রোবট বানিয়ে ফেলতে পারো ।

তোমরা যদি শিখতে চাও, তাহলে এখন থেকে ফোটন ম্যাগাজিনেই তোমরা আরডুইনোর লিখিত কোর্স পেয়ে যাবে । এছাড়াও, 10 MS সায়েন্স ক্লাব গ্রুপেও ভিডিও কোর্স পেয়ে যাবে ।
তাহলে আর দেরি কিসে? এখনি শুরু করে দাও আরডুইনো প্র্যাকটিস !

ড. ম্যাক্সের গবেষণা

নুসরাত জাহান নাজিফা
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

রাত ২ টা বেজে ৩০ মিনিট। ড. ম্যাক্স তার টেবিলে একটা কাগজের উপর কলম ধরে স্থির মূর্তি হয়ে বসে আছেন। টেবিলটা নিতান্তই অগোছালো। কতগুলো মোটা বই খোলা অবস্থায় ছড়ানো ছিটানো। টেবিলের নিচে রাখা বাস্কেটে কতগুলো ছেঁড়া আর দুমরানো মুচরানো কাগজ এ পূর্ণ। ড. ম্যাক্স কাগজটায় দুটো লাইন লিখলেন। কি মনে করে ওই কাগজটাও দুমড়ে মুচড়ে বাস্কেট এ ছুড়ে মারলেন। কাল সকাল ৯ টায় তার একটা সায়েন্স কনফারেন্স এ যোগ দিতে হবে। যার বিষয় হচ্ছে, "মানবজাতির অস্তিত্ব ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে নিজস্ব গবেষণা ও বক্তব্য স্থাপন"। ড. ম্যাক্স তার চিন্তাভাবনা ও গবেষণা দিয়ে যেসব ধারণা পেয়েছেন, সেগলো অন্যান্য বিজ্ঞানীমহলের কাছে নিরেট হাস্যরসাত্মক হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। কিভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং গুছিয়ে বলবেন, সেটা নিয়ে তিনি সন্দিহান।

পরদিন যখন ড. ম্যাক্স এর ঘুম ভাঙ্গে, তখন তিনি নিজেকে পড়ার টেবিলে কলম হাতে পড়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করেন। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখেন ৭ টা ৩০ বাজে। হঠাত তার খেয়াল হলো, বক্তব্য নিয়ে তিনি কিছুই প্রস্তুত করেননি। তিনি দ্রুত কাগজ কলম নিয়ে লেখা শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ত্রিনিলা – 015, তার কেয়ারটেকার রোবট সকালের নাস্তা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে দ্রুত হাতে লিখে শেষ করলেন তার বক্তব্য। কিন্তু ততক্ষণে ৯ টা বেজে গেছে। তিনি যখন কনফারেন্স এ প্রবেশ করলেন, তখন একেকজন তাদের বক্তব্য শুরু করে দিয়েছেন। বড় হলরুমের মধ্যে স্টেজ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে দর্শক সারিতে প্রথমে রয়েছে একসারি উঁচু মহলের বিজ্ঞানী আর পেছনে রয়েছে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা। সবারই চোখে – মুখে কৌতূহল, গবেষকরা কে কি উপস্থাপন করবেন, তা নিয়ে। সবমিলিয়ে হলরুমের পরিবেশটা নিঃশব্দ। শুধুমাত্র যে বক্তব্য পেশ করছে, তার কথাগুলোই চারদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। সকলের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে। যখন ড. ম্যাক্সের পালা আসলো, তখন তিনি খুব গাম্ভীর্যতা নিয়ে মঞ্চে উঠলেন। ড. ম্যাক্সকে অনেকেই পছন্দ করেন না তার তার উদ্ধত্ব মেজাজের জন্যে। তাই, তার বক্তব্যে কোন ত্রুটি বা অনুষ্ঠান চলাকালীন হেনস্তায় ফেলার জন্যে অনেকেই উদগ্রীব হয়ে ছিল। তিনি তার বক্তব্য এভাবে শুরু করলেনঃ

"আমরা এখন পৃথিবীতে যে কয়জন মানুষ বেঁচে আছি, হয়তো বা তাদের সংখ্যা ২০ থেকে ২২ কোটি হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, পৃথিবীতে একসময় এর থেকে আরও অনেক অনেক বেশি মানুষ বাস করতো, যারা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও পৃথিবীর ওজনস্তর ক্ষতি হওয়ার কারণে প্রান হারিয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কাঁচের তৈরি ঘরটায় বেঁচে আছি, যার আয়তন

পৃথিবীর প্রায় এক – চতুর্থাংশ। এখন মানুষের বংশ আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমার ধারণা, এসব নিছক কল্পনামাত্র। আমরা কেউই এখন বেঁচে নেই। আমাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে জোড় করে। আর জন্ম, মৃত্যু, ছেলেবেলা – এসব আমাদের মস্তিষ্কে স্থাপন করা হয়েছে কিছুর স্মৃতির সমন্বয়ে। আমার এমনটি মনে হচ্ছে, কারণ যেসব বইপুস্তক পড়ি, তাতে জন্মমৃত্যু সম্পর্কে যা জেনেছি, তার সাথে আমাদের কোন মিল নেই বরং, আমার মনে হয় কিছু দ্বারা আমাদের নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে”।

ড. ম্যাক্স এই কথা বলার পরপর ই অনেকে হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছিল, কেউবা টিপ্পনি কাটছিল। কেউ একজন আবার বলে উঠলো, “বদ্ধ উন্মাদ”। আবার, কয়েকজন কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল। সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর যখন ড. ম্যাক্স সবে হলরুম ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন জুনিয়র গ্রুপের একটি ছেলে তাকে ডাকলো। ছেলেটিকে ড. ম্যাক্স আগেও দেখেছেন, নাম উইলস জন। ছেলেটি তাকে বললো, “স্যার, আমি আপনার সাথে কিছু বলতে পারি কি”? “কেন নয়”, ড. ম্যাক্স ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন। জন বলও, “স্যার, আপনার বক্তব্যের সাথে আমার ধারণা অনেকাংশেই মিলে যায়, কিন্তু এসব নিয়ে আমার ধারণা খুব বেশি স্পষ্ট নয়। আমি কি এই নিয়ে আপনার থেকে কিছু জানতে পারি”?

“অবশ্যই, কিন্তু আজ নয়। কাল আমার সাথে দেখা করো”, ড. ম্যাক্স বললেন।

কিছুদিন পর ....

ড. ম্যাক্সকে সেদিনের পর থেকে আর দেখা যায় নি। গবেষণাগারে না যাওয়ায়, তার খুব কাছের বন্ধু ড. এলেক , আর উইলস জন মিলে তার বাসায় গিয়েছিলেন খবর নিতে। ড. ম্যাক্সের সাথে সর্বশেষ কথা হয়েছিল জনের, হলরুম থেকে বের হওয়ার সময়ে।

ড. এলেক ও জন এসে ড. ম্যাক্সের বাসার দরজায় কড়া নাড়ে। কিছুক্ষন পর তার দুই পরিচারিকা রোবট দরজা খুলে দিল। “ড. ম্যাক্স কোথায়”? ত্রিনিলা – 015 তার স্বভাবগ যান্ত্রিক ভাষায় জবাব দিল, “তিনি নেই’। “কোথায় গেছেন

মান উন্নত ভিডিও খোজার ঝামেলা আর নয়

DIGITAL Interactive সূচিপত্র

নিয়ে এসেছে সমাধান।

ডাউনলোড

তিনি?” “আমরা জানি না”।

হতাশ হলেন ড. এলেক। ওই মুহূর্তে রোবটটি বলে উঠল “তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হ্য, তখন আমরা কাজ করছিলাম”। চমকে উঠলেন ড. এলেক। “কারা নিয়ে গেছে, কি কারণে নিয়ে গেছে, কিচ্ছু জানেন না? কিছুই কি বলেন নি তিনি? আর কারাই বা তাকে নিয়ে যাতে পারে?” রীতিমত কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ড. এলেক এর। কিচ্ছু ভালো লাগছিল না তার। এদিকে জন এরও মনটা কেমন কেমন করছে ড. ম্যাক্স এর জন্যে।

ত্রিনিলা – 015 বলেই দিল, “তিনদিন আগে কনফারেন্স থেকে ফেরার পর তিনজন মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান রোবট আসে বাড়িতে। “আমরা তোমাদের টিকিয়ে রেখেছি শুধুমাত্র প্রাণের অস্তিত্বের রহস্য জানবার জন্যে। সেই কাজে সাহায্য না করে আমরা কিভাবে মানুষদের নিয়ন্ত্রন করছি, সেটা রীতিমত উদ্ঘাটনও করে ফেলেছ দেখা যায়! প্রয়োজনের চেয়ে তুমি বেশি ভেবে ফেলেছ, যেটা তোমার পরে কল্যান বয়ে আনবে না”, এই বলে ড. ম্যাক্সকে জোড় করে নিয়ে যায়, আর তাকে দেখা যায় নি” এইটুকু বলে থামলো।

ড. এলেক ও জন – একে অপরের দিকে অজানা এক আতংক ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

বিঃদ্রঃ বর্তমান পৃথিবীতে নতুন নতুন জিনিসপত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে মানুষের নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্যে। এখন অনেক কাজই মানুষকে কায়িকশ্রম দিয়ে করতে হয় না। এসব কাজ করছে মানুষেরই তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligance – AI)। মানুষ যে হারে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে পরিবেশ দূষণ করছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে, তাতে এই ধারণা অমূলক নয়, যে একসময় পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তাই আসুন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরতা কমাই, পরিবেশ দূষন রোধ করি, এবং আগামী প্রজন্মের জন্যে সুন্দর বিশ্ব গড়ি।

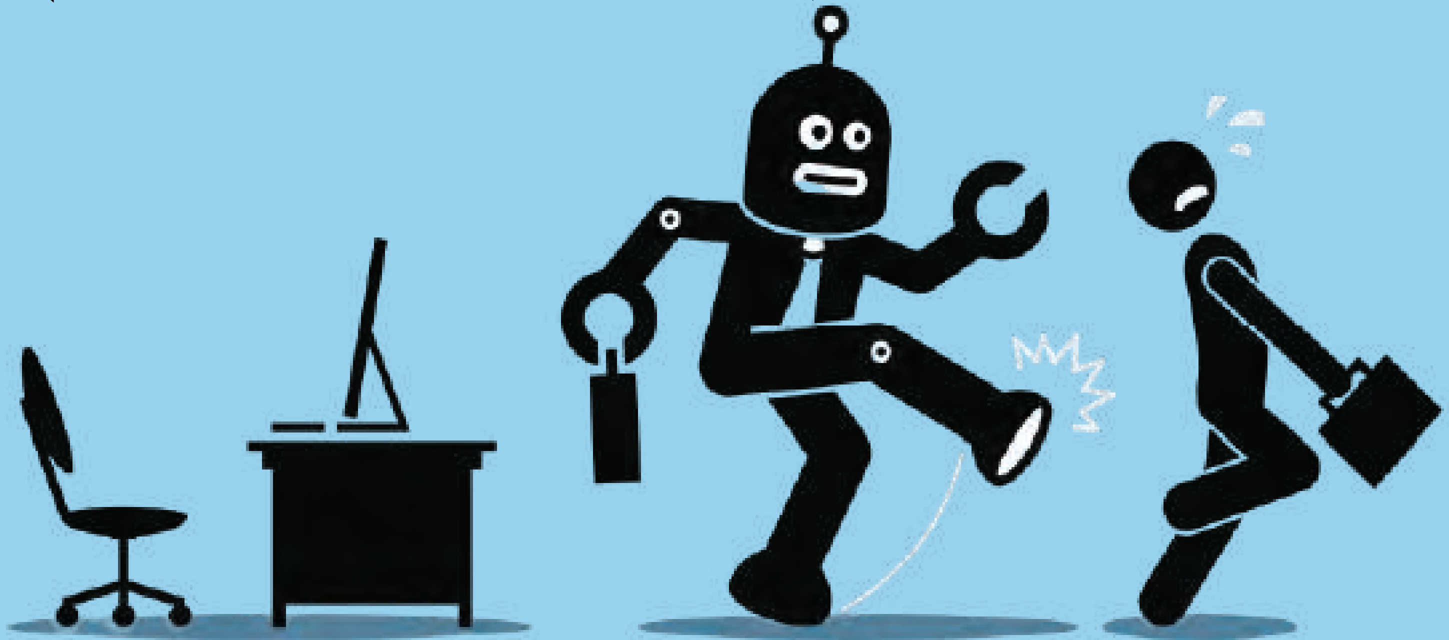

হাইপারলুপ সমাচার

সাদমান সাদিক শোভন

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুয়েট।

বিশ্বে এখন পর্যন্ত যতগুলো পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক হল হাইপারলুপ। হাইপারলুপ হলো দ্রুতগতির পরিবহন ব্যবস্থা। এটি একই সাথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে সক্ষম।
টেসলা ও স্পেসএক্স যৌথভাবে হাইপারলুপের প্রস্তাবনা দেয়। ঘন্টায় 760 মাইল বেগে চলা এই হাইপারলুপ যেকোনো ট্রেন বা দ্রুত গতির বিমান এর চেয়েও বেশি গতিতে চলতে সক্ষম।

সম্প্রতি মানুষসহ হাইপারলুপের সফল ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে প্রতিষ্ঠানগুলো শতাধিকবার এই বিষয়টি পরীক্ষা করেছেন।

কিভাবে কাজ করবে এই হাইপারলুপ?

এটি অনেকের কাছে একটি বড় প্রশ্ন। কেননা এত গতিতে চলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই উত্তরটি দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক হাইপারলুপের গঠন কি রকম।

এটি মূলত একটি পাতাল রেল ব্যবস্থা। হাইপারলুপ নাম দেয়ার কারণ হলো এটি একটি লুপের মধ্য দিয়ে চলবে। এটি একটি ক্যাপসুল সদৃশ। এছাড়াও ক্যাপসুলটিতে আবহাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা, সংঘর্ষ মুক্ত, বিমানের চেয়েও তিনগুণ গতি, অপারেশনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা সহ আরো অনেক ধরনের ফিচার থাকবে।

ঘর্ষণ সবসময় গতির বিরুদ্ধে কাজ করে। ফলে কোনো কিছুর গতি বৃদ্ধি করতে হলে ঘর্ষণ অবশ্যই হ্রাস করতে হবে। হাইপারলুপটি একটি বায়ুশূন্য মাধ্যম দিয়ে চলবে। আরে সেখানে কোন ঘর্ষন থাকবে না । তবে কৃত্রিম ঘর্ষণ ব্যবহার করতে পারে ক্যাপসুল গুলি। এছাড়াও লুপের উপরের অংশে চৌম্বক থাকবে যা ক্যাপসুলটিকে ভাসমান অবস্থায় রাখবে। এই চৌম্বক গুলোকে হলবাখ- অ্যারেস বলা হয় যা অতি শক্তিশালী চৌম্বক । তবে বেশি দূরত্বে এই উচ্চতা ধরে রাখা একটি বড় সমস্যা।

ইউরোপের অনেক দেশে হাইপারলুপ রেল প্রকল্প ব্যবহার করা হবে। এমনকি ইলন মাস্ক এ হাইপারলুপ কে মঙ্গল গ্রহে ব্যবহারের জন্য উপযোগী মনে করেন। এক সময় মানুষ ভাবতো ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটারের উপরের গতিতে চলা আসলে কষ্টসাধ্য। কিন্তু ঘন্টায় ১২০০ কিলোমিটার গতিতে চলা এই হাইপারলুপ ট্রেনকে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে।

আমাদের শিক্ষক

নুমেরি সাত্তার অপার
বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়,
বুয়েট ক্যাম্পাস, ঢাকা।

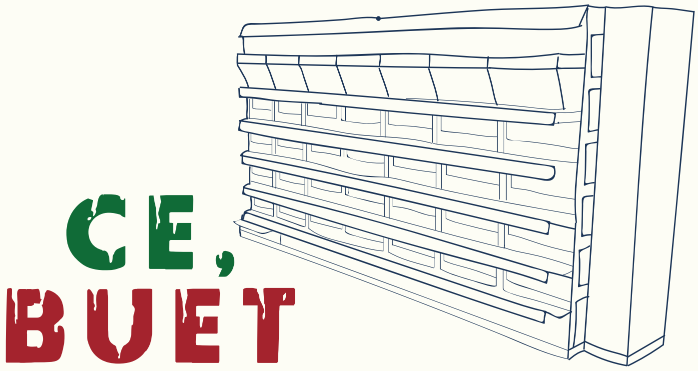

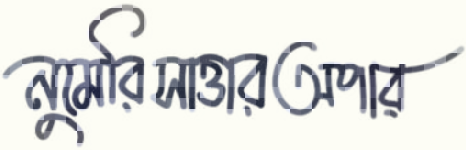

শিক্ষাজীবনঃ

আমি ২০১৩ সালে ঢাকার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে SSC তে GPA 5 সহ পাশ করি। তারপর, ঢাকার রাজউক কলেজ থেকে ২০১৫ সালে HSC তে GPA 5 লাভ করি। এরপর ২০১৫ সালে বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভর্তি হই। আশা করছি, সবার দোয়ায় ২০২১ এর শুরুতে গ্রাজুয়েশন শেষ করছি।

শিক্ষাজীবন নিয়ে আগে একটা গর্ব কাজ করতো কেননা, আমি যেইবার JSC দিই, সেবার আইডিয়াল সারাদেশে প্রথম হয়; SSC তেও আইডিয়াল সারাদেশে ১ম হয়। আর HSC তে রাজউক প্রথম হয়। আর বুয়েটেরও সারাদেশে সুনাম রয়েছে তাই পুরো শিক্ষাজীবন নিয়ে গর্ববোধ হতো অনেক। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারি যে প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন থেকে আসলে নিজের অর্জনটাই জীবনে বেশি লাগে। তাই এখন ব্যক্তি আমি নিজের স্কিল/জ্ঞান অর্জনের পেছনেই বেশি সময় ব্যয় করছি।

আমার গল্পঃ

আমি ছোটবেলায় নানু বাসায় বড় হই, একদম ২ বছর বয়স থেকে। ছোট বেলা মামা আর খালাদের মাঝে প্রচন্ড আদরে বড় হওয়ায় আমি, তাদের জীবন থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করি। আমার মামা,খালা বেশিরভাগই ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ায় আমি দুইটা ধরণের জীবনকে কাছ থেকে দেখি তাই আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি কেননা আমি ধারণা করতে পেরেছি ডাক্তারি জীবন আর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন দুইটায় কি কি করতে হয়। আমি বড়দের সাথে বড় হবার সুবাদে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছি অনেক। সত্যি বলতে, আমার বয়সী বাকিদের তুলনায় এগিয়ে ছিলাম বাস্তবতা বোঝায় এটা আমাকে এখন পর্যন্ত যেকোনো সিদ্বান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

আমার অনেক সময় নিয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল ছোট থেকেই, একটা জিনিস অনেক গভীরভাবে ভাবতে চাইতাম, এক লাইনের অনেকগুলো অর্থ হতে পারে এভাবে চিন্তা করতে করতে অনেক সময় লাগতো। যেহেতু আমি কলেজের বাইরে আর তেমন স্যারের কাছে মাসের পর মাস পড়িনি তাই এটা আমার করতেই হতো; আমি বলবো, এইভাবে পড়াশুনা করাটা আমাকে শুধু পড়াশুনা শেখায়নি বরং একটা যেকোনো বিষয় তৈরি করতে শিখিয়েছে নিজের স্টাইলে, সেই কারণেই বুঝি আমি এখন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। কারণ আমি অন্য কোনো স্যারের কাছে পড়ে আসা পড়াটা পড়িয়ে দেইনা, বরং নিজের চিন্তা আর জ্ঞান নিয়ে একটা অরিজিনাল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি।

তোমাদের জন্যঃ

আমার যদিও জীবনে এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি তবু এইটুকুন বয়সে এসে আমি প্রচুর পজিটিভ আর আশাবাদী একজন মানুষ। অনেক কঠিন সিচ্যুয়েশন বা খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে গেলেও হতাশ হইনা,আর সবগুলো ঘটনাকেই শিক্ষা হিসেবে নিই। যাই ঘটুক, আমরা যদি একটা খারাপ কিছু ঘটলেও এভাবে ভাবি যে "এটাই আমার জন্য সেসময় ঘটা সম্ভাব্য ঘটনার মধ্যে বেস্ট, অন্য যেগুলোকে আমরা সাময়িক ভাবে ভাবছি ভাল হতো,তাতেও অনেক খারাপ হতে পারতো তাহলেই দেখবা মনে প্রশান্তি কাজ করছে। আর এটা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারিতই করে রেখেছেন যে আমার সাথে কি ঘটবে, তাই চেষ্টা চালানোর পরেও যদি কিছু সাফল্য না পাই তবে ভাবতে হবে সেই সাফল্যটা আমার জন্য ক্ষতিকর ছিল।

ধরো, আমি একটা লটারি টিকেট কিনলাম। দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে এখন, ১) আমি সেই লটারি থেকে লক্ষ-কোটি টাকা জিতলাম ২) আমি টাকাটা জিতলামনা। সবাই এখানে জানে কোনটা ভাল তাইনা? অবশ্যই ১ নং টা সবাই চায়। এখন ধরো আমি লটারি জিতলাম তাহলে আমি কিভাবে ভাববো?
আমি এরকম ভাববো, যে আমি যদি আজ লটারি জিতে যেতাম, সেই লক্ষ-কোটি টাকা পেয়ে আমি হয়তো অলস হয়ে পড়তাম। ভাবতাম, আমার তো টাকা আছেই, বিনিয়োগ করলেই হবে এখন। এরপর আমার বিনিয়োগ হয়তো জলে যেত, আর আমি আমার মূল্যবান সময় এই টাকার বিলাসিতায় হারিয়ে ফেলতাম আর ততদিনে আমার বন্ধুরা নিজেরাই একেকজন কোটি টাকার হিউমান রিসোর্সে পরিণত হতো। আমি তাই লটারি না জিতায় এখন অলস হচ্ছিনা আর নিজেই একটা এসেট হিসেবে গড়ে উঠছি স্কিল আর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ব্যাস, আমার মন শান্ত হয়ে যাবে এটুকুন ভাবলেই।

তোমরা এখন যারা এই আর্টিকেলটা পড়ছো, তারা একেকজন একেক অবস্থায় আছো, বা সামনে যাবে। মাথায় রাখবে, নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে কোথাও চান্স পাও বা না পাও, চাকুরী হয় বা না হয়, ভালো

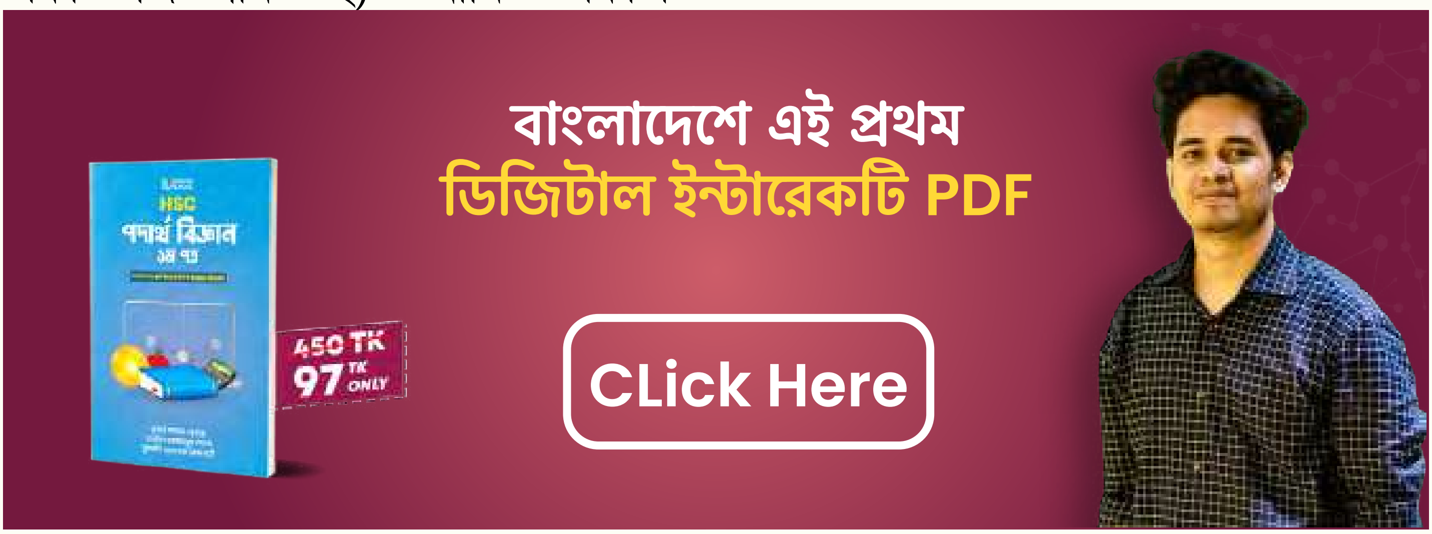

ফলাফল আসুক বা না আসুক; যাই হবে তা জীবনে ভালোর জন্যই হচ্ছে। এটা হল আমার তোমাদেরকে দেয়া প্রথম উপদেশ।

আরেকটা বিষয় নিয়ে বলবো- সেটা হল আমাদের নগদ প্রাপ্তির আশা । আমরা যারা যারা অল্প পরিশ্রম করেই সাফল্য আশা করি সেটা যেন না করি কখনো। অনেকেই তোমরা ভাবো যে আমরা কেন পড়াশুনা করি এত বছর ধরে? কি লাভ এতে? এখনই তোমাকে কিছু চাকুরী দিলে তুমি তা পারবে, তাহলে সেই ট্রেনিং না দিয়ে কেন তোমাকে ১২-১৬ বছর পড়াচ্ছে? আজ আমি এটারই আমার ভাষায় উত্তর দিব।

সামনের যে যুগ আসছে তা আজকের পৃথিবী থেকে অনেক ভিন্ন হবে। প্রযুক্তি এতদ্রুত সব বদলে দিবে যে আজকের বেশিরভাগ পেশার কোনো অস্তিত্ব সামনে থাকবেনা,নতুন পেশার উদ্ভব হবে। ঠিক যেমন আজকে থেকে ১০ বছর আগেও কতগুলো চাকুরী ছিল যা এখন আর নেই। তোমাকে তাই মনে একটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে আজকে তোমার যা যা পড়া হচ্ছে তা তোমার ব্রেনকে ট্রেইন করছে আর ঘটমান অভিজ্ঞতাগুলো তোমাকে বাস্তবতা শেখাচ্ছে। আজকের পৃথিবীর যা যা আবিষ্কার/উদ্যোগ/চাকুরী তার সবগুলোর শুরুই একটা চিন্তা থেকে, ২০ বছর পরের পৃথিবীর নতুন আবিষ্কারগুলোও আসবে চিন্তা থেকে। আর তাই আমি তোমাদের পড়াশুনার সমস্যা ও সমাধানের চিন্তার পাশাপাশি জীবনের আসন্ন ঘটনা ও তার সমাধান নিয়ে চিন্তা করতে বলবো। আমাদের পড়াশুনার উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই যেন আমরা চিন্তা করতে পারি, সমাধান বের করতে পারি। পড়াশুনার সময় আমরা যে চিন্তা করি, তা আমাদের ব্রেনের একেকটা অব্যবহৃত অংশকে এক্টিভ করে; আর পরবর্তীতে সেই অংশটা আমাদের জীবনে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে চিন্তা তথা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাই যতই আমরা পদার্থবিজ্ঞান-গণিতে মাথা খাটাবো ততই আমাদের মস্তিষ্কের সেল আনলক হবে যা আমাকে ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করবে।

ফোটন

বুয়েট বৃত্তান্ত

তাহসিন আল শামস্
EEE, BUET

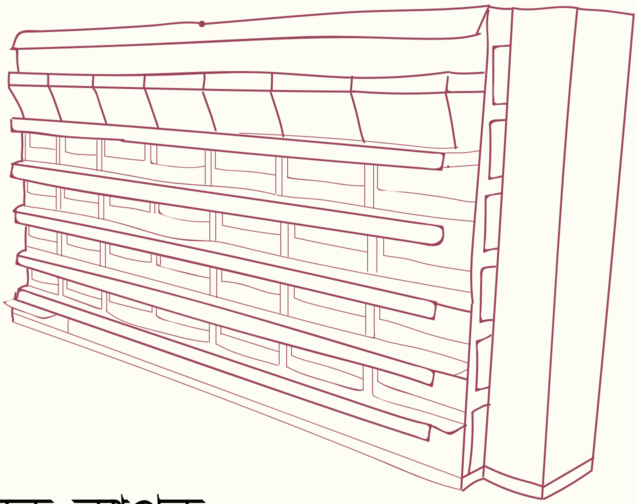

"বুয়েট"

ছোট্ট একটি নাম, কিন্তু এর ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক।
বুয়েট একটি স্বপ্নের নাম, যে স্বপ্ন লালন করে আছে এদেশের লাখো লাখো ছাত্র-ছাত্রী। যে স্বপ্নের তাড়নায় দিন-রাত একাকার করে পরিশ্রম করছে হাজারো শিক্ষার্থী। শুধু যে শিক্ষার্থীদের মধ্যেই এ স্বপ্ন সীমাবদ্ধ, তা-ও কিন্তু নয়। "বুয়েট" স্বপ্নে বিভোর তাদের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনরাও।
বুয়েট একটি ব্র্যান্ডের নাম, যে ব্র্যান্ড গায়ে লাগানো মাত্রই নিতান্ত সাদা-সিদে ছেলেটিও আত্মীয় বা বন্ধুমহলে পেয়ে যায় মেধাবি তকমা। যে ব্র্যান্ড টিউশনির বাজারে এনে দেয় আলাদা মাত্রা। ফেসবুক প্রোফাইলে হাজারো ছবির ভীড়ে "Studies at BUET" কথাটাই হয়ত সবার প্রথমে চোখে পড়ে।
একারণেই দেখা যায়, নীলক্ষেতের প্রিন্টিং দোকানগুলো বুয়েটের নকল আইডি বানানোর ঢল। ফেসবুকে এমন প্রচুর প্রোফাইল পাওয়া যায়, যেখানে বুয়েট কথাটা বড় বড় করে শোভা পাচ্ছে, কিন্তু বান্দা হয়ত আদৌ কখনও বুয়েটে পা-ই দেয়নি।
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, বুয়েটে কি এমন আছে, যা বুয়েটকে এহেন ব্র্যান্ড ভ্যালু দিয়েছে। কি এমন জাদুর কাঠি লুকিয়ে রেখেছে বুয়েট, যার ফলে এত-শত ভার্সিটির ভীড়ে তার এত ডিমান্ড!! এই লেখায় আলোচনা করব বুয়েটের সেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই।

স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি: রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে পড়া এদেশে বুয়েট যেন একমাত্র ব্যতিক্রম। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বুয়েটে যতগুলো ভর্তি/নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে, কোন পরীক্ষায়ই দুর্নীতির বিন্দুমাত্র অভিযোগ উঠেনি। এজন্যই এদেশে মেধাবিদের প্রথম পছন্দ থাকে বুয়েট, কারণ তারা জানে, এদেশ তাদের মেধার মূল্যায়ন করতে না পারলেও বুয়েট ঠিকই তাদের মেধার মূল্যায়ন করতে পারবে।

মেধাবি ক্লাসমেট: যেহেতু একটি স্বচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিবছর বুয়েট বাংলাদেশের বাঘা বাঘা মেধাবি শিক্ষার্থীদের ভর্তি করায়, একারণে বুয়েটে ভর্তি হবার পর প্রথম যে ব্যাপারটা তোমার ভাল লাগবে সেটা হল, তুমি একঝাঁক তুখোড় মেধাবির সান্নিধ্যে থাকতে পারবে। একঝাঁক প্রতিভাবান বন্ধু পাওয়া কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার। হয়ত তুমি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চাও, তোমার কিছু বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী টিমমেট লাগবে। কোন সমস্যা নেই, বুয়েট এমন একটি প্রতিভার ভান্ডার, যেখানে তুমি একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বিভিন্ন বিষয়ে ঝানু ক্লাসমেট পেয়ে যাবে।

তীব্র প্রতিযোগিতা: চিন্তা করে দেখ তো, তোমার সামনে, পিছে, ডানে, বামে সবাই সারাদিন পড়াশোনা করছে, এসব দেখে তোমার মনেও কি কিছুটা সিরিয়াসনেস আসবে না? ঠিক তাই। পুরো বুয়েট লাইফে তোমাকে একটি তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে কাটাতে হবে, এক কদমও পিছনে পড়ে থাকার সুযোগ নেই এখানে। এ প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে বিরক্তিকর মনে হলেও, এ প্রতিযোগিতাই তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে দিবে, এ প্রতিযোগিতাই কর্পোরেট জগতে তোমাকে এগিয়ে রাখবে অন্যদের চেয়ে, বিদেশে স্কলারশীপ পাবার দৌড়ে এগিয়ে রাখবে কয়েক কদম।

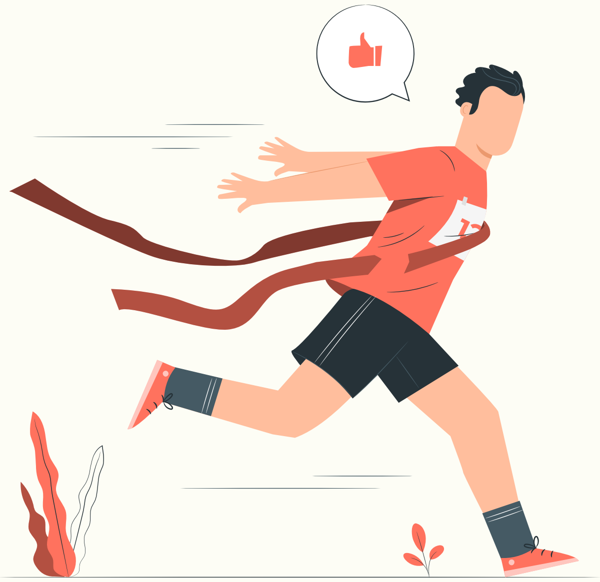

বিদেশে স্কলারশীপের সুযোগ: বিদেশে স্কলারশীপ পাওয়াটা মূলত নির্ভর করে তোমার থিসিসের উপর। বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি আন্তর্জাতিক মানের থিসিসের জন্য যতটা না নিজের পরিশ্রম প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা এবং গাইড করার জন্য একজন অভিজ্ঞ সুপারভাইজার। যেহেতু বুয়েট সারাবছরই সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্টে যুক্ত থাকে, পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেস্টও সম্পন্ন করে বুয়েট (তোমরা হয়ত সিএনজি বা রডের গায়ে "বুয়েট টেস্টে প্রমাণিত" কথাটি দেখেছ। এটাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেস্ট) একারণেই বুয়েটে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ল্যাব ফ্যাসিলিটি। শুধু তা-ই নয়, যেহেতু বুয়েট একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়, একারণে একজন অভিজ্ঞ থিসিস সুপাইভারজারের অধীনে কাজ করার সুযোগ পাওয়া বুয়েটে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সহজ কথায়, বিদেশে স্কলারশীপ পাবার সকল উপকরণ বুয়েট তোমাকে দিবে, এখন সেটা কাজে লাগাতে পারবে কি না তা তোমার হাতে।

ফোটন

বিনোদনের ব্যবস্থা: বুয়েটে যে শুধুমাত্র পড়াশোনা করার ব্যবস্থাই আছে তা কিন্তু নয়। বুয়েটে আছে বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। খেলাধুলার জন্য বুয়েটে আছে ফুটবল মাঠ, ভলিবল কোর্ট, টেনিস কোর্ট, বাস্কেটবল কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট। এছাড়াও প্রতিটি হলেরই আছে নিজস্ব খেলার মাঠ। ইনডোর খেলার মধ্যে বুয়েটে প্রতিটি হলে আছে টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারম। শরীরচর্চার জন্য বুয়েটে আছে জিমনেশিয়াম, যেখানে তুমি শরীরচর্চার সকল আধুনিক উপকরণ পেয়ে যাবে। এছাড়াও আছে প্রায় ২৫ টি ক্লাব, যেখানে তুমি তোমার শখের কাজগুলো করার সুযোগ পাবে।

টিউশনি: টিউশনির বাজারে বুয়েটিয়ানদের প্রায় একক আধিপত্য সর্বজনবিদিত। যাদের ভার্সিটি জীবনেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা, তাদের জন্য বুয়েট একটি আদর্শ জায়গা।

রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস: এটি বুয়েটের নতুন সংযোজন। পত্রিকার পাতা খুললেই যেখানে দেখা যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির বিষাক্ত ছোবল; রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় হল দখল, চাঁদাবাজি, শিক্ষক লাঞ্ছনাসহ ছাত্রসংগঠনগুলোর নানারকম অপকর্মে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জর্জরিত, সেখানে বুয়েটই একমাত্র ব্যতিক্রম – এখানে সকল প্রকার রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন নিষিদ্ধ। বুয়েটে তুমি পাবে ঝঞ্ঝাটমুক্ত একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস। (যদিও এহেন পরিবেশ আপনা-আপনি আসেনি, এর জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বুয়েটের এক মেধাবি ছাত্রকে। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি)

ভর্তি হতে চাও স্বপ্নের ভার্সিটিতে? তাহলে আর দেরি কীসের, এখনই বই-খাতা নিয়ে বসে পড়। মনে রেখ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুয়েটের স্বপ্ন দেখলে তা সারাজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে। এমনভাবে প্রস্তুতি নাও যেন বুয়েটের স্বপ্ন তোমাকে ঘুমোতেই না দেয়।

সবার জন্য শুভকামনা।

দৃষ্টিভ্রম - চোখও ধোঁকা দেয়!

লাবিবা সালওয়া ইসলাম

দ্বাদশ শ্রেণী
সরকারি সিটি কলেজ,চট্টগ্রাম

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। কোনোটা আমাদের কাছে বাস্তব, তো কোনোটা অবাস্তব মনে হয়। নিত্যজীবনে এমন অনেক ঘটনাই থাকে যার নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখা আমরা খুঁজে পাই না। কোনো ঘটনা হয়তো রহস্যে পূর্ণ,কোনোটা আমাদের বিভ্রান্তির কারণ কিংবা কোনোটা দৃঢ সত্যের ন্যায় আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। মূলত পঞ্চইন্দ্রিয়ের দরুন আমরা বিভিন্ন ঘটনাকে উপলব্ধি করি! মস্তিষ্ক যার প্রধান কেন্দ্র। ইন্দ্রিয় কর্তৃক গৃহীত সিগন্যাল মস্তিষ্ক হয়েই আমাদের করণীয়সমূহ বলে দেয়। আজ এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা প্রতিনিয়ত আমাদের বিভ্রান্ত করে তথা বিভ্রমের সৃষ্টি করে।

""মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি হয়,যা মূলত ভ্রান্তধারণা হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। কোনো কৌশল দ্বারা প্রতারিত হওয়া কিংবা কোনো অবস্থান ও উপস্থিতির ভুল ব্যাখ্যাকে ইলিউশন বলা হয়।"" তো বন্ধুরা, বুঝতেই পারছো! আজ কথা বলবো ইলিউশন নিয়ে।
ইলিউশন এর কিছু প্রকারভেদ ও রয়েছে। যথাঃ-
অডিটরি,ভিজ্যুয়াল,ট্যাক্টাইল,টেম্পোরাল!
চলো, এবার কিছু উদাহরণ দেয়া যাক,

ধরো,তুমি কোনো একটি আঁকা ছবি কিংবা তোলা ছবি উপভোগ করছো। ছবিটি থেকে আসা আলো তোমার চোখে আপতিত হয়ে একটি কোণ উৎপন্ন করবে,এটাকে আমরা আপতন কোণ বলি। যদি এই আপতন কোণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তো প্রতিসরণ কোণের ও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে। ফলে তোমার দেখা ছবিটা ইলিউশনের সৃষ্টি করবে। মূলত ছবিগুলো কৌশলে আঁকা কিংবা তোলা,যার দরুন এমন হয়।এসব ছবিকে ""Hydroid image"" বলা হয়।

কিংবা ধরো, তুমি কোনো জাদুর মঞ্চে আছো। জাদুকর তার সহকর্মীকে হঠাৎ উধাও করে দিলো। হ্যাঁ,অবাক করার মতো হলেও এটিই ইলিউশন তথা তোমার দৃষ্টিভ্রম।

আবার,আয়নায় কোনো ছোট জায়গাকে বড় মনে হওয়া ও এক প্রকার ইলিউশন।

এবার ধরো, তুমি কোনো এক রঙিন ছবির একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে তাকিয়ে আছো। কিছু সময় পর চোখ সরিয়ে নিয়ে কোনো একটি সাদা কালো ছবির দিকে তাকাতে বলা হলো, তুমি তাকিয়ে দেখলে ছবিটিও রঙিন। কিন্তু তা মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের জন্য। কয়েক সেকেন্ড পরে ছবিটি তোমার চোখে সাদা কালো হিসেবে দেখালো। এর কারণ কি জানো?
মস্তিষ্ক তোমার প্রথম দেখা রঙিন ছবিটির ফল্স কালারগুলো ধারণ করে রাখে এবং কয়েক সেকেন্ড যাবৎ তুমি সে কালারগুলোই দেখতে পাও। যার কারণে দ্বিতীয়বারের দেখা সাদা কালো ছবিটিও কয়েক সেকেন্ডের জন্য তোমার কাছে রঙিন মনে হয়েছিলো। এটিকে বলা হয় ""After image illusion "".

এবার আসি 3D ড্রয়িং নিয়ে।হ্যাঁ বন্ধুরা, এটাও এক ধরনের ইলিউশন। এ ধরনের ড্রয়িংয়ে পার্সপেক্টিভ ও অ্যাঙ্গেল অল্টারেশনের মাধ্যমে তোমার চোখকে ধোঁকা দেয়া হয়। মনে হয় এটি ড্রয়িং না, বরং জীবন্ত। আরো অবাক করার ব্যাপার এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাস্তায় 3D ড্রয়িং করা হয়,যার দরুন গাড়ি চালকের চোখেও ইলিউশন সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে গাড়ির স্লো ডাউন হয়ে যায় এবং দূর্ঘটনার পরিমাণ কমে আসে।

এখন বলবো পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় ইলিউশন সৃষ্টিকারী ""আইনস্টাইন মাস্ক "" এর ব্যাপারে।
এটিকে যে অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখা হোক না কেন, মনে হবে চেহারা সর্বদা উত্তল মনে হবে। তুমি ভিতরের অবতল কোনো অংশ খুঁজেই পাবে না। হ্যাঁ, অবাক করার মতোন হলেও এটাই ইলিউশন। এটাই তোমার চোখের ভ্রম! এটাই ধোঁকা!"

জীববিজ্ঞান

১। কোন শ্রেণিতে প্লাকয়েড আঁশ রয়েছে?

ক) তারামাছ খ) হাঙ্গর গ) কইমাছ ঘ) কাতলমাছ

২। কোনটি পত্রঝরা উদ্ভিদ?

ক) Pongamia pinnata খ) Heritiera fomes

গ) Shorea robusta ঘ) Ceriops decandra

৩। পনির তৈরিতে ব্যবহৃত এনজাইমের নাম-

ক) পেকটিন খ) রেনিন গ) ক্যাটালেজ ঘ) পেপেইন

৪। কোন অঙ্গানুতে অক্সিসোম দেখা যায়?

ক) মাইটোকন্ড্রিয়া খ) নিউক্লিয়াস গ) রাইবোসোম ঘ) লাইসোসোম

৫। মানব জিনোমে ক্ষারক-যুগলের সংখ্যা-

ক) ৩ মিলিয়ন খ) ৩০ মিলিয়ন গ) ৩০০ মিলিয়ন ঘ) ৩০০০ মিলিয়ন

৬। 'Cycas' উদ্ভিদের শস্য নিচের কোন ধরনের?

ক) হ্যাপ্লয়েড খ) ট্রিপ্লয়েড গ) পলিপ্লয়েড ঘ) কাতলমাছ

৭। নিচের কোনটি রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে?

ক) থ্রম্বপ্লাসটিন খ) হিস্টামিন গ) সেরোটনিন ঘ) হেপারিন

৮। সবচেয়ে বেশি খাদ্যসার শোষিত হয় কোথায়?

ক) জেজুনামে খ) সিকামে গ) পাকস্থলিতে ঘ) ডিওডেনামে

৯। শ্বাসতন্ত্রের কোন অংশে গ্যাসীয় বিনিময় হয়?

ক) ট্রাকিয়া খ) অ্যালভিওলাস গ) ব্রঙ্কিওল ঘ) ব্রঙ্কাস

১০। আন্তঃকশেরুকা চাকতিতে কি ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়?

ক) স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি খ) চুনময় তরুণাস্থি

গ) শেত-তন্তুময় তরুণাস্থি ঘ) স্বচ্ছ তরুণাস্থি

গণিত

১। যদি $fx= 11+x$ হয়, তবে $f(f(f(x)))$ এর মান নির্ণয় কর।

২। যদি $A-1 = 57\ 17\ 37\ 27$ হয়, তাহলে $A2+2A$ এর মান নির্ণয় কর

৩। $-i$ এর ঘনমূল তিনটির যোগফল নির্ণয় কর

৪। সমাধান করঃ $2x + x = 3$

৫। $1+7x + 5x+3x$ এর মান নির্ণয় কর

৬। $(x-1x)16$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ কোনটি?

৭। $1+ 13 + 132+ 133+$ .... অসীম পর্যন্ত এর মান কত?

৮। $25x^2+16y^2=400$ এর উৎকেন্দ্রিকতা হবে –

৯। $fx= 1x$ এর ডোমেন কত?

১০ ।$x^4-4x^3+4x^2+5\ x^2$ এর লঘিষ্ঠ মান কোনটি?

ফোটন

পদার্থবিজ্ঞান

১। কোনো কুয়া থেকে 30 m উপরে পানি তোলার জন্য 5 kW এর একটি পাম্প ব্যবহার করা হয়। পাম্পের কর্মদক্ষতা 90% হলে প্রতি মিনিটে কত লিটার পানি তোলা যাবে? ($g = 9.8\ m/sec^2$)

২। 2 kg ভরের একটি বস্তু স্থির অবস্থায় থাকা আরেকটি বস্তুর সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটালো। সংঘর্ষের পর প্রথম বস্তুটি তার আদিবেগের এক-চতুর্থাংশ বেগ নিয়ে একই দিকে চলতে থাকল। আঘাতপ্রাপ্ত বস্তুটির ভর কত?

৩। একটি রেডন নমুনার 60% ক্ষয় হতে কত সময় লাগবে? (রেডনের অর্ধায়ু 3.8 days)

৪। 9.1×10^{-31} ভরবিশিষ্ট একটি ইলেক্ট্রন যদি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে 0.53×10^{-10} m ব্যাসার্ধের কক্ষপথে ঘুরতে থাকে, তবে তার কৌণিক বেগ কত? (প্ল্যাংকের ধ্রুবক 6.63×10^{-34} Js)

৫। একটি স্থির বস্তু বিস্ফোরণের মাধ্যমে দুটি 1 kg নিশ্চল ভর বিশিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত হল এবং পরস্পর (এখানে c = আলোর বেগ) বেগে দূরে সরে গেল। মূল বস্তুটির নিশ্চল ভর নির্ণয় কর।

৬। হীরকের প্রতিসরণাংক তলে একটি আলোক রশ্মি 60^0 কোণে আপতিত হলো এবং হীরকের মধ্যে প্রতিসরণ কোণ 12^0 পাওয়া গেল। হীরকের সমবর্তন কোণ কত?

ফোটন

৭। ভেক্টর প্রোডাক্টের মান নির্ণয় কর (2i-3j)-(i+j-k)(3i-k)

৮। একটি টানা তারে টানের পরিমাণ 4 গুণ বৃদ্ধি করলে কম্পাঙ্ক কত গুণ বৃদ্ধি পাবে?

৯। F ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট দুটি উত্তল লেন্সকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখলে তাদের মিলিত ফোকাস দূরত্ব কত হবে?

১০। ভেক্টর A, B, C এর মান যথাক্রমে 12, 5 ও 13 এবং A+B=C। A ও B ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত?

রসায়ন

১। ক) তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির বিভিন্ন অঞ্চলের কোন রশ্মিগুলো নিম্নলিখিত কাজে ব্যাবহার করা হয়?

i) Wi-Fi

ii) Detecting fake currcy

iii) Optical fiber communication

iv) MRI Machine

খ) তোমার উত্তরের রশ্মি গুলোকে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নিম্নতর ক্রমানুসারে সাজাও

২। 200ml 1.3×10^{-3} M ঘনমাত্রার $AgNO_3$ দ্রবণের সাথে 100ml 4.5×10^{-5} M ঘনমাত্রার Na_2S দ্রবন মেশানো হল। এতে কি কোন অধঃক্ষেপ পড়বে? যুক্তি দাও [$K_{sp}=1.6\times10^{-49}$]

৩। একটি পেন্সিল দিয়ে "Bangladesh University of Engineering and Technology "BUET") লিখতে 0.55mg গ্রাফাইট প্রয়োজন হয়।

ক) ঐ লিখার মধ্যে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বের কর।

খ) অক্সিজেনে দহন করলে STP তে উক্ত কার্বন পরমাণুহসমূহ দ্বারা উৎপন্ন গাসের আয়তন লিটারে বের কর।

৪। নিচে জৈব অণুর সংকরণসমূহ সনাক্ত কর এবং সেই সাথে মোট σ বন্ধন ও বন্ধন নির্ণয় কর। ফোটন

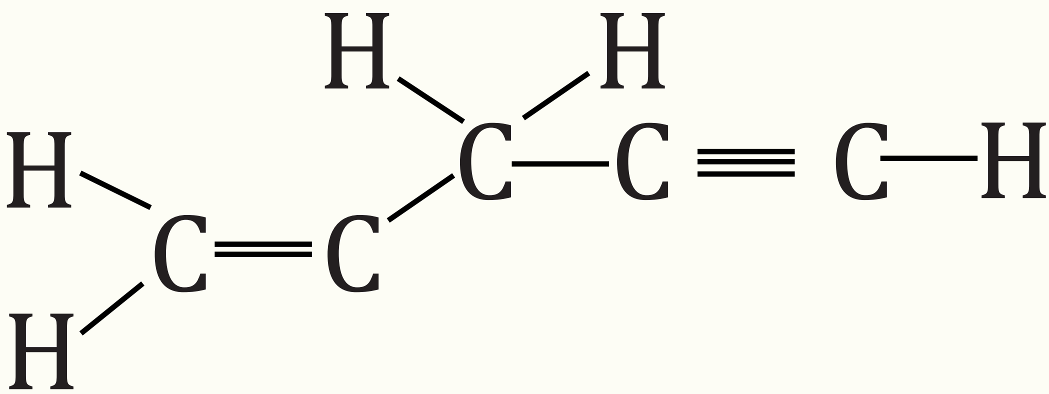

৫। টাইটানিয়াম দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা আকরিক থেকে নিষ্কাশন করা যায়।

i)অধিকতর সক্রিয় ধাতুর ব্যাবহারঃ $TiO_2+2Mg \rightarrow Ti+2MgO$

ii)আকরিকের তড়িৎ বিশ্লেষণঃ TiO_2Ti+O_2

কাঙ্ক্ষিত উৎপাদে বিক্রিয়ক পরমাণুর সর্বাধিক উপস্থিতির ধারণা ব্যাবহার করে উপরের কোন পদ্ধতিটি গ্রিনার নির্ণয় কর।

[Ti=47.88 and Mg=24.3]

৬। আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নিম্নের কোন যৌগটি উৎপন্ন করে?

ক) Ethene খ) Ethane গ) Ethyne ঘ) Ethanel

৭। CO2 গাসের অনুতে কার্বন অক্সিজেনের ভরের অনুপাত কত?

ক) 3:3 খ) 6:5 গ) 3:8 ঘ) 3:4

৮। প্রোটিন অণুর মধ্যে অ্যামাইনো এসিডের অণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে-

ক) Glycosidic bond খ) Peptide bond

গ) Hydrogen bond ঘ) Metallic bond

৯। নিচের কোন যৌগটি জ্যামিতিক সমানুতা প্রদর্শন করে?

ক) $(CH_3)_3N$ খ) C_3H_6 গ) $(CH_3)_2NH$ ঘ) C_4H_8

১০। নাইট্রেট অ্যানায়নে কয়টি ইলেকট্রন আছে?

ক) 19 খ) 23 গ) 31 ঘ) 32

ফোটন

জীবন দিয়ে পূর্ন স্বপ্ন

রাফায়েত নূর
ইফতির কাছের বন্ধু

ইফতেখার ইফতি, পদবি কন্টেন্ট রাইটার। জীবনের শেষ মুহূর্তে রাইটিং ইউনিট এ কাজ করলেও আমাদের সাথে পথচলা তার বহুদূরের। পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র ৪ টি অধ্যায়, রসায়ন প্রথম পত্র সকল অধ্যায়, জৈব যৌগ সবটুকুর হাইপারলিংকিং ও কভার পেজ ইফতির হাত এ করা।

নিজের ২০০৭ সালে কেনা একটি ল্যাপটপ ছিল তখন সেটা দিয়ে ই কাজ শুরু। খারাপ পরিবারের ছেলে ছিল না একটা সময় ছিল যখন তার ক্যামেরার দাম ছিল ৬৫ হাজার এর ও বেশি। ওর চশমা ও লুক এর জন্য সবাই হ্যারি-পরটার নামে জানতাম। হঠাৎ তার পরিবার এ ঝড় নেমে এল বাবা বিদেশ থেকে দেশে চলে আসল দালাল চক্রের হাত এ প্রায় নিঃস হয়ে গেল সেই থেকে ই তার জীবন ঘুরে গেল। প্রথমে ফোটগ্রাফার থেকে উপার্জনের চেষ্টা ছিল, সত্যি বলছি তার মত মানুষের portrait ছবি আমদের বন্ধু মহল এর কেউ তুলতে পারত না কারো ছবি তোলা ভাল হলে বলা হত ইফতির মত ছবি তোলা হয়েছে। কিন্তু এ সপ্ন বেশি দিন স্থায়ী হল না ৩ জুলাই ২০১৭ তার গলায় ছুরি ধরে ক্যামরা ছিনতাই হয় এবং ছিনতাই কারীরা চলন্ত সি এন জি থেকে তাকে খিলগাঁও তিলপাড়ার রোডে ফেলে দে । সে দিন বেচে গিয়েছিল হয়ত আমাদের এই পরিবার এ আসবে বলেই সব ধাক্কা কাটিয়ে নতুন করে উপার্জনের পথে ছুটতে থাকে এসব চিন্তা তাকে পড়ালেখা থেকে দূরে নিয়ে যায়। আমরা বন্ধুরা ওকে দিয়ে প্রাকটিকাল খাতা লিখতে দিতাম ওর ড্রয়িংও ছিল অতুলনীয়, আমার কাছে এখন একটা ওর লেখা আর্ট পেপার আছে যেটায় এস এস সি physics এর সমস্ত সূত্র লেখা। একসব টেলেন্ট এর জন্যই নিজের পিসি না থাকা সত্ত্বেও আমাদের টিম এ যুক্ত হয় সল্প সময়ে কিছু টাকা জমিয়ে নিজে একটা কাজ চলার মত পুরানো পিসি কিনে যা দিয়ে ক্লাস ৩-৮ এর

ম্যাথ প্রায় ৬০% রাইটিং কম্পলিট করে দিয়ে যায় সে। শেষ মাসে তার পুরানো পিসি টা নষ্ট হয়ে যায় তাই কাজ করতে পারছিল না বেশ কয়েক দিন। ইফতি সবকিছুর আগে stunt গ্রুপ MSVZ, Team Reckless সহ বিভিন্ন গ্রুপ এ যুক্ত ছিল তার সব পুরানো বন্ধুরা এখন বাইক রাইডিং গ্রুপ গুলতে সে সুবাদে সে বাইক buy and sell এর ব্যবসা করবে ঠিক করে কেননা তার পরিবার এর প্রয়োজন এর তুলনায় তার উপার্জন অনেক কম। একটা বাইক সেল করে ১০ হাজার টাকা লাভ করে, তারপর থেকে আমাকে প্রতিদিন বলত দোস্ত টাকা গুলো কি করা যায় একটা ব্যবসা করতে চাই এই বাসা ভাড়া টা আব্বু দিলে গ্যাস এর সিলিন্ডার আমার কেনা লাগে এর জন্য আবারো বাইক নিয়ে নাড়া চারা শুরু করা। সবসময় বলত দোস্ত আমিতো ভাল ছাত্র না ইভা কে পড়াবো। ইভা একবার English এ ৯৮ পেয়েছিল ইফতি অর আম্মু কে বলে আম্মু ইভা ৯৮ পাইল ১০০ পাইল না অকে তোমরা ওকে ভাল মত পড়াও না, ওর আম্মু উত্তর দিয়েছিল তুই কত পাস, ও বলল ইভা কে পড়া লেখায় পারফেক্ট বানাবো, ওকে আমার কাজ গুলাও শিখাবো যেন কোনো দিক দিয়ে পিছায় না থাকে। বোনটাও সব কথা শুনত ভাই এর। কেউ কেউ হয়ত বলবে ছেলে টা বাইক কেন চালাছিল তাদের জন্য বলা ভাই ওদের বাসায় টিভি ছিল না, নিজের ফোনছিল না, বাসায় ওয়াইফাই লাইন ছিল না। সময় কাটানোর মত ছিল একটা বিড়াল। সবাই নিশ্চই অনুভব করতে পারছ বাহিরে বাইক চালিয়ে সে নিজের কষ্ট গুল কিছুক্ষন ভুলে থাকত। আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো কারন লাগে না । আমি ট্রাকের দোস দিব না, না ইফতির। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তার উপর কথা বলব না....

.

এই ইফতি মৃত্যুর আগের মুহুর্তেও ভাবেনি যে কম্পিউটার সে চালাতে পারে নাই তা তার বোন ৫ দিন পর চালাবে, তার বোন এর পড়া লেখার খরচ নিয়ে তার পরিবার বা তার কারোই আর ভাবতে হবে না। এরজন্য তোমাদের ধন্যবাদ বিশেষত জাহিদ স্যার আপনাকে। সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু তার সপ্ন আজ সত্যি হওয়া শুরু করেছে। এখন বাকিটা আবারো আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা আমাদের অর্ধেক দায়িত্ব পুরা করেছি বাকি অর্ধেক দায়িত্ব হল, এরকম অন্য যাদের পাব মৃত্যুর আগেই তাদের সাহায্য করা। যেন কাউকে জীবন দিয়ে সপ্ন না কিনতে হয় আর ইফতি এবং ওদের মত সব পরিবার এর জন্য দোয়ার অনুরোধ রইল।

ফোটন

কিভাবে লেখা পাঠাবো?

লিখা পাঠাতে নিচের আইকন ক্লিক করো

অথবা মেইল এ লিখা পাঠাতে

- মেইলের সাবজেক্ট এ টপিক এর নাম থাকবে
- মূল বডি তে আসল লিখা লিখবে

magazine.photon@gmail.com

সমাপ্ত